সরীসৃপ কথা
শিবতোষ দাস

সরীসৃপ কথা

শিবতোষ দাস

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

অক্টোবর ১৯৮৫ (October 1985)

আশ্বিন ১৯০৭ (Asvina 1907)

Sarisrip Ki Kahani (Bengali)

(বাংলা অনুবাদ ঃ অহিভূষণ ভট্টাচার্য)

মূল্যঃ ১৪ টাকা

Price : Rs. 14.00

বিক্রয় কেন্দ্র—প্রকাশন বিভাগঃ

* ৮ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯
* সুপার বাজার (সেকেন্ড ফ্লোর), কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী-১১০০০১
* কমার্স হাউস, করিমভয় রোড, ব্যালার্ড পায়ার, বোম্বাই-৪০০০৩৮
* এল. এল. অডিটোরিয়াম, ৭৩৬ আন্নাসলাই, মাদ্রাজ-৬০০০০২
* বিহার স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক বিল্ডিং, অশোক রাজপথ, পাটনা-৮০০০০৪
* ১০-বি, স্টেশন রোড, লক্ষ্ণৌ-২২৬০০১
* প্রেস রোড, গভর্ণমেন্ট প্রেসের নিকট, ত্রিবান্দ্রম-৬৯৫০০১
* স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম বিল্ডিং, পাবলিক গার্ডেনস্, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০৪

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাটিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১১০০০১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুখ্য প্রবন্ধক, ভারত সরকারের মুদ্রণালয় (প্রকাশন বিভাগ), সাঁত্রাগাছি, হাওড়া দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মধ্যজীব যুগে এই বিশাল পৃথিবীতে বুকে হাঁটা প্রাণীর ক্রমবিকাশের সূচনা হয়। সেই যুগে এমন কয়েক রকমের ভীমকায় বুকে হাঁটা প্রাণীও ছিল যাদের কথা জেনে আশ্চর্য হতে হয়। এই সব বুকে হাঁটা প্রাণীকে বলা হয় সরীসৃপ।

সাপ, টিকটিকি কিংবা আলস্যের অবতার কচ্ছপ এবং কুমীর এই বিশাল সরীসৃপ জাতির অন্তর্ভুক্ত। সেই যুগে সরীসৃপ জাতির আদি দানব সাপও ছিল। বৃহদাকার টিকটিকি, উড়ন্ত টিকটিকি, বহুরূপী টিকটিকি, গৃহবাসী টিকটিকি এসবই টিকটিকি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। পৃথিবীর সব দেশেই নানা জাতের সাপ দেখতে পাওয়া যায়। পরিবেশ এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন দেশে এদের রঙ, রূপ ও আকার-ভেদ ঘটে থাকে। বেশীর ভাগ সাপ ইঁদুর বা অন্য কোনো জন্তুর তৈরী গর্তেই বাস করে। কিছু কিছু সাপ জলেও থাকে। তবে ডাঙায় বাস করে এমন সাপের সংখ্যাই বেশী। আদিম যুগের দানবাকৃতি সরীসৃপের ফসিল এখনও পাওয়া যায়। এই সরীসৃপ ৩৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হত। এই আদিম সরীসৃপ পরিবারের সর্বশেষ বংশধর স্ফেনোডোন টিকটিকি আজও বেঁচে আছে। এই টিকটিকি নিউজিল্যান্ড দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায় । সেখানকার আদিবাসী মাওরিরা একে 'টুয়াটোরা' নামে ডাকে ।

আশ্চর্যের কথা এই যে বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে ঘুরে বেড়ায় যে টিকটিকি সেও বিশাল সরীসৃপ পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। আজ পর্যন্ত এই জাতের প্রায় ১৮৯২টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও পরিবেশ অনুসারে নানারকম রঙ, আকৃতি ও আকারের টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কোনো কোনো সরীসৃপ ৭ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের শরীর পাতলা ত্বকে ঢাকা। কোনো কোনো টিকটিকির লেজ এত লম্বা হয় যে লেজের সাহায্যে তারা শত্রুকে ভীষণ আঘাত করে। কারো কারো লেজে কাঁটাও থাকে। তারা এই কাঁটাওয়ালা লেজকে শত্রুর শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারে। রঙ বদল করা বহুরূপী গিরগিটির কথা সম্ভবত সকলেই শুনে থাকবেন। শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এরা রঙ বদলায়।

অলস কচ্ছপ এবং ভয়ংকর কুমীরও এই বিশাল সরীসৃপ পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। এদের শরীর শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে। এই কঠিন আবরণের ওপর তলোয়ারের জোর আঘাতেও বিশেষ কিছু হয় না। আমেরিকার প্রকান্ড আকারের কচ্ছপ তো এত বড় হয় যে তার পিঠের ওপর আরাম করে বসাও যায়।

এই বইয়ে সরীসৃপ সম্বন্ধে এই সব অজানা রহস্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দানব সরীসৃপ, বিভিন্ন শ্রেণীর টিকটিকি, ভয়ংকর কুমীর এবং কচ্ছপের সম্বন্ধে নানা রোমাঞ্চকর তথ্য সরল ভাষায় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পুস্তক রচনায় আমার দুই কন্যা নিবেদিতা ও সুনন্দিতা প্রথম থেকেই আমাকে প্রেরণা দিয়ে এসেছে । ওরা আমার স্নেহের পাত্রী । আমার স্ত্রী মীনা দাস এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াসে পদে পদে বিষয়গত প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পুনর্বিচার এবং পুনর্লিখনে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

আশা করি পাঠকগণ আমার এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাবেন।

শিবতোষ দাস

সূচী

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবেরই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ঘটে। এর ফলেই এত বিরাট সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি জন্মায়। এমনও দেখা গেছে, খনি বা কোনো জমি খননের সময় নানা রকমের হাড়গোড় কিংবা মাটির স্তরে স্তরে আদিম জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া যায়। কখনো কোনো প্রাচীন জীবের অস্থির কিছু অংশ, আবার কখনো বা সম্পূর্ণ শরীরের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। কোথাও বা এই কঙ্কাল সম্পূর্ণ শিলীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় । আবার কোথাও বা এইসব হাড় আদি ও অবিকৃত রূপেই পাওয়া যায় । কিন্তু বেশী পুরোনো নিদর্শনগুলো ফসিল রূপেই দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলিকেই সেই সব পুরোনো জীবজন্তু বা বনস্পতির 'ফসিল' বলা হয়। এই ফসিলই আদিম ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে আমাদের আদিযুগ সম্পর্কে নানা তথ্য যোগায়। কখনো কখনো মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন জীবের ফসিল বা হাড় এত লম্বা হয় যে মনে হয় এগুলি যে সব প্রাণীর হাড় তারা আকারে দানবের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এগুলো অতি প্রাচীন যুগের জীবজন্তুর ফসিল। ফসিল ছাড়াও শত শত প্রাচীন অস্থিও পাওয়া গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই সব হাড়ের আলাদা আলাদা অংশ ঠিকমত জোড়া লাগিয়ে কঙ্কালের পূর্ণ রূপ দিয়েছেন। এই ফসিল এবং অস্থিগুলোর সংযুক্ত রূপ থেকে তাদের আদি ইতিহাস জানা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খননের ফলে কোথাও কোথাও ১৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হাড় পাওয়া গিয়েছে, আবার কোথাও বা দানবাকার প্রাণীর মাথার খুলিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই রকম কিছু নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীন যুগের বিশালকায় সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরাও আছে। এই দানবাকার জীবের তুলনায় আজকালকার মানুষকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হয়। এইসব দানবাকৃতি সরীসৃপের মস্তিষ্ক খুব ছোট হত। হয়ত এই কারণেই, এরা নিজেদের বুদ্ধি কম থাকার দরুন তা আত্মরক্ষার কাজে লাগাতে পারত না। হয়ত এজন্যেই এই সব বিশালকায় দানব জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে পৃথিবী থেকে দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু তাদের হাড়গুলোই তাদের পুরা কাহিনী শোনাবার জন্যে বর্তমান রয়েছে। আজ ভূগর্ভে এই ফসিলগুলিই শুধু বিদ্যমান। এগুলোই প্রাচীন যুগের জীবজন্তুর, মানবের এবং বনস্পতির ইতিহাসের সাক্ষী।

প্রাচীন কালের জীবজন্তুর দেহ, বিশেষ করে তাদের কঙ্কাল মাটির নীচে বহু বছর চাপা পড়ে থেকে ফসিলে বা জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে । প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই সব ফসিলের সাহায্যে শত শত বছর আগেকার প্রাচীন এবং লুপ্ত জীবজন্তুর ইতিহাস পুনরুদ্ধার করেছেন ।

আদি দানব সরীসৃপ

সরীসৃপের ফসিল বা জীবাশ্ম থেকে জানা যায়, সমগ্র স্তন্যপায়ী জীব ও পাখীদের পূর্বপুরুষ 'টুয়াটোরা'র মতই ছিল। এদের ক্রমবিকাশের চিত্র অঙ্কন করলে এই ধারণা হয় যে, এদের বংশোদ্ভূত প্রাণীরা এক কল্পিত জীব থেকে জন্ম নিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই জীবের সঙ্গে 'টুয়াটোরা'র অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই জীবটির ক্রম-বিকাশের বিষয়ে জানতে হলে প্রাচীন যুগের জীব-জন্তুদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান আবশ্যক।

সরীসৃপের ফসিলকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ

১। কীলদংশী সরীসৃপ (স্ফেনোডোন-আদিম)
২। দানব সরীসৃপ (ডাইনোসোরিয়া)
৩। পক্ষী সরীসৃপ (টেরাসোরিয়া)
৪। মৎস্যাকার সরীসৃপ (ইকিয়োসোরিয়া)
৫। গোধিকা সরীসৃপ (প্লাসিয়োসোরিয়া)
৬। অসমানদন্তী সরীসৃপ (এনোমোডোনাসিয়া)

স্ফেনোডোন (আদিম) বা 'টুয়াটোরা'

নিউজিল্যান্ড-নিবাসী মাউরীরা সাপকে বলে 'টুয়াটোরা', 'টুটাটোট' অথবা 'টুয়াটারা'। ওদের ভাষায় এর অর্থ কাঁটাওয়ালা টিকটিকি। প্রাচীন যুগে নিউজিল্যান্ড দ্বীপে এই জীব বাস করত। কিন্তু বর্তমান কালে উত্তরাঞ্চলের কোনো কোনো দ্বীপে এই প্রাণীর দর্শন পাওয়া যায়। বন্য বরাহ, কুকুর ও বিড়াল এদের শত্রু। আবার মাউরীরাও এদের ধরে খায়। আজকাল এরা উঁচুনীচু জমিতে গর্ত বানিয়ে তার মধ্যে থাকে এবং সামান্য শব্দ শুনলেই গর্তে ঢুকে পড়ে। এরা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে এবং জলের মধ্যে শুয়ে থাকতে ভালবাসে। জলের মধ্যে এরা ঘন্টার পর ঘন্টা নিঃশ্বাস না নিয়েই বিশ্রাম করে। এরা মাংসাশী জীব এবং ছোট ছোট মাছ, কেঁচো এবং কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে। বাস করে সমুদ্রের ধারে। এই টুয়াটোরা কাঁকড়া জাতীয় জীব খেয়ে থাকে। বাইরের দিক থেকে এদের আকৃতি টিকটিকির মত। কিন্তু টিকটিকি এবং সাপে যতটা প্রভেদ, এদের সঙ্গে টিকটিকিরও ততটাই পার্থক্য। এই আকৃতিজাত পার্থক্যের মধ্যেই এদের রূপ-বৈচিত্র্য এবং বিকাশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

গর্ত খোঁড়ার সময় টুয়াটোরা পেট্রিল নামে এক সামুদ্রিক পাখীর সাহায্য নেয় এবং উভয়ে এক সঙ্গেই গর্তে বাস করে। এদের গর্তের ব্যাস ১০—১২ সেঃ মিঃ হয়। গর্তের মুখ থেকে ৬০—৯০ সেঃ মিঃ ভেতরে ২ মিঃ লম্বা, ৩০ সেঃ মিঃ চওড়া এবং ৩০—৬০ সেঃ মিঃ উঁচু ঘর থাকে। এই ঘর ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। গর্তের মুখ থেকে এই ঘরে যেতে হলে প্রথমে নীচে নেমে পরে ওপরে উঠতে হয়। এই বড় ঘরটির বাঁ দিকে সাধারণত সামুদ্রিক পাখী পেট্রিল বাস করে এবং ডান দিকে টুয়াটোরা থাকে।

এক টুয়াটোরা অন্য কোনো টুয়াটোরাকে নিজের গর্তে ঢুকতে দেয় না। যদি কেউ গর্তে হাত দেয়, তাহলে সে তার হাতে ভীষণ জোরে কামড়ে দেয়। তরুণ বয়সী টুয়াটোরার দুই চোয়াল ও টাকরায়ও দাঁত থাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের দাঁত পড়ে যায় এবং এরা দন্তহীন হয়ে পড়ে। এরা খুব দ্রুত দৌড়তে পারে এবং মানুষ বা কুকুরের পেছনে দৌড়ে ভীষণ জোরে কামড়ে দেয়। রাত্রিকালে অনেক সময় এরা কর্কশ চীৎকার করে।

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্ত্রী-টুয়াটোরা বালির গর্তের ভেতর প্রায় ১০টি ডিম পাড়ে। ডিমের খোসাগুলো খুব শক্ত হয়। রোদের তাপে তারা গরম থাকে। আগষ্ট মাসে ডিমের ভেতর বাচ্চাগুলো যথেষ্ট

বড় হয়ে যায় এবং যখন তারা তেরো মাসের হয়, তখন ডিম থেকে বাইরে বেরিয়ে এদিকে ওদিকে চলাফেরা করে। ষাট বছর আগে পনের থেকে তেইশ টাকার মধ্যে একটি টুয়াটোরা কিনতে পাওয়া যেত। ১৯১৪ সালে ২২৫ টাকায় একটি টুয়াটোরা কেনা হয়েছিল। কিন্তু এখন কেউ টুয়াটোরা বেচতে পারে না। এখন নিউজিল্যান্ড থেকেই কেবল টুয়াটোরা সংগ্রহ করা যায়।

টুয়াটোরা সাধারণত ৯০ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। এদের লেজ লম্বা ও চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। পুরো শরীরটা লোমে ঢাকা। লোমগুলো ছুঁচলো কাঁটার মত খাড়া থাকে। এরা চার পায়ে চলে। প্রত্যেক পায়ে পাতলা চামড়ায় ঢাকা পাঁচটি আঙ্গুল থাকে। আঙ্গুল-গুলোতে বড় বড় নখ হয়। এরা ব্যাঙের মত জলে স্থলে ঘুরে বেড়ায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারা এই-ভাবে জীবনযাপন করে আসছে।

বৈজ্ঞানিকরা এই জাতীয় টিকটিকির তৃতীয় নয়নের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। এই তৃতীয় চোখ এদের মাথার মাঝখানে থাকত। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে এই তৃতীয় নয়ন একদা কর্মক্ষম ছিল। এই বিষয়ে বর্তমানে প্রাণীবিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। টুয়াটোরা এখন এজাতীয় প্রাণীর এক-মাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বেঁচে আছে। তবে বৈজ্ঞানিক-গণের মতে সম্ভবত প্রায় সব জাতের টিকটিকিই এই টুয়াটোরার ক্রমবিকাশের ধারাতেই জন্মেছে। বালুকাময় মরুভূমি এবং পাহাড়ের শিলার বাসিন্দা টিকটিকি থেকে আরম্ভ করে হনুমানের মত লেজ-ওয়ালা গেছো টিকটিকি ও তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে মিল ও পার্থক্য অনুমান করুন এবং এরপর আমাদের ঘরের ছাদে ও দেয়ালে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকি থেকে শুরু করে জলচর বা পাখীর মত গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়ানো টিকটিকির কথা চিন্তা করুন। আর এই সব টিকটিকির সঙ্গে সাপের মত বুকে হাঁটা পদহীন টিকটিকির তুলনা করুন।

দানব সরীসৃপ

প্রাচীন যুগের টুয়াটোরা জাতীয় প্রাণীর ফসিলের সঙ্গে সেই যুগের এই বিশালাকৃতি সরীসৃপের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের ফসিল ইয়োরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। এই ফসিলগুলো দেখলে বোঝা যায়, এই জাতীয় প্রাণী জলচর এবং স্থলচর ছিল। এদের লেজ অত্যন্ত দীর্ঘ হত এবং লেজের সাহায্যে এরা সহজেই জলে সাঁতার কাটতে পারত। সম্ভবত এই ধরণের সরী-সৃপেরা অনেকে কাদা কিংবা ডাঙ্গায় থাকত এবং এদের দেহটা ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড়, কিন্তু সে তুলনায় মাথাটা ছিল খুব ছোট। এদের অনেক প্রজাতিও ছিল যাদের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রজাতি হল এটলান্টাসোরাস, ইগুয়ানুডান এবং স্টেগো-সোরাস। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এটলান্টাসোরাসের শরীর প্রায় ৪½ মিঃ লম্বা হত। এদের গলা বেশ লম্বা ও মোটা হত, কিন্তু মাথাটা হত শরীরের অন্যান্য অংশের অনুপাতে অনেক ছোট। লেজটা গলার চেয়েও লম্বা হত। আর চারটি পায়ের পাতা হাতীর পায়ের মতন মাংসল হত। এজন্য এরা জোরে হাঁটতে পারত না। এটলান্টা-সোরাসের কোন কোন সহচর ১৮ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হত এবং গরুবাছুরের মত ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকত।

দ্বিতীয় প্রজাতির প্রাণী ইগুয়ানুডান প্রথম প্রজাতির চেয়ে আকারে ছোট হত। এদের মাথা একটু বড় হত এবং পেছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে বড় ও মজবুত হত। সামনের পা দুটো ছিল ছোট। এ দুটোর সাহায্যে এবং পিছনের পায়ের জোরে এরা লাফাতেও পারত। পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল ছড়ানো। এই আঙ্গুলের সাহায্যে এরা গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। লেজ মোটা ও ছোট হত। এরাও ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকত।

স্টেগোসোরাস ছিল এক অত্যন্ত বিচিত্র ধরণের প্রাণী। এদের পিঠ ছিল আঁশে আবৃত আর এই আঁশগুলো অদ্ভুত, অসমান ও বড় বড় হাড়ের মতো উঁচু হয়ে থাকত। এরা প্রায় ৭ মিঃ লম্বা হত, কিন্তু এদের গলা এবং সামনের পা দুটো প্রথম প্রজাতির দানব সরীসৃপের চেয়ে ছোট ছিল। মাথা তো খুবই ছোট হত। এত ছোট যে দূর থেকে দেখাই যেত না।

এখনকার হাতীর চোখ যেমন তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় ক্ষুদ্র, সেই রকমই সে যুগের স্টেগোসোরাস দানব সরীসৃপের মাথাও শরীরের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ছিল। এই রকম একটা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কতটা বুদ্ধি থাকতো সেটা একবার কল্পনা করে দেখুন। এই শ্রেণীর সরীসৃপেরাও ঘাসপাতা খেত।

পক্ষী সরীসৃপ

ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উড়ন্ত সরীসৃপের ফসিল পাওয়া গেছে। মনে হয় এই সরীসৃপেরা কিছুটা উড়তে পারত। এদের দেহের বাইরের গঠন অনেকাংশে পাখীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন মনে হয়। তবে পার্থক্যটা ছিল এই যে এদের ডানা ছিল না এবং এদের হাড়ের গড়ন পাখীদের হাড়ের গড়নের থেকে পৃথক ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এদের মাথা পাখীদের মাথার মতন মনে হত। কিন্তু এদের মুখে বড় বড় দাঁত থাকত। পাখীর মত এদের ঠোঁট হত না। এদের গলা যথেষ্ট লম্বা হত। ডানা ছিল না। অতএব এরা উড়তে পারত না। এদের হাত ও পায়ের গঠন বড়ই অদ্ভুত ছিল। হাতের চতুর্থ আঙ্গুলটি খুব লম্বা হত এবং তার ডগা থেকে পেছনের হাতের তালু পর্যন্ত চামচিকের পাখার মত চামড়া হাতের উল্টো পিঠের চামড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকত। এই চামড়ার সাহায্যেই এরা সামান্য উড়তে পারত। এদের লেজও ছিল খুব লম্বা এবং শেষের দিকটা চওড়া। এদের পেছনের পায়ের চামড়া লেজের সঙ্গে জোড়া থাকত, এজন্য ওড়ার সময়ে এই লেজ হালের কাজ করত।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা এই সরীসৃপকে পাখীদের পূর্বপুরুষরূপে স্বীকার করেন। সম্ভবত এই সরীসৃপ কোনো কোনো পাখীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এটা বলা উচিত হবে না যে সমগ্র পক্ষীজাতি এই সব সরীসৃপ থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

মৎস্যাকার সরীসৃপ

এই সরীসৃপ অতি বৃহদাকার হত এবং এরা সমুদ্রেই বাস করত। এদের ফসিল ইংল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া এবং উত্তর আমেরিকার ব্যোয়িং শিলাভূমিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের কিছু কিছু নিদর্শন ইয়োরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ভারতবর্ষেও পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে কোনো কোনোটা ১২ মিঃ পর্যন্ত লম্বাও হত। এদের মাথা ও চোখ খুব বড় বড় হত। ঘাড় একরকম ছিল না বললেই চলে। হাত, পা, লেজ ও পেছনের দিকটা আকারে মাছের মত ছিল। সমুদ্রের মধ্যে এরা চলাফেরা করতে পারত। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মৎস্যাকার সরীসৃপকে সামুদ্রিক তিমি নামেও অভিহিত করেন। কিন্তু এদের হাড়ের গড়ন থেকে মনে হয় যে এরা সরীসৃপ পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। টুয়াটোরার মত এদেরও তৃতীয় একটি চোখ ছিল বলে অনুমিত হয়। মৎস্যাকার সরীসৃপের স্ত্রীজাতি বাচ্চা প্রসব করত বলে মনে হয়। কারণ এমন কিছু কিছু ফসিল পাওয়া গেছে যাদের দেহের ভেতরে বড় বড় শাবকের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের ফসিল আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় যে এরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল।

গোধিকা সরীসৃপ

এই জাতির সরীসৃপ জলে এবং স্থলে বসবাস করত। কিন্তু জলের একান্তই অভাব রয়েছে এমন জায়গায় বাস করতে পারত না। ইউরোপ, উত্তর ও

দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের বহিরাকৃতি বড় বিচিত্র ছিল। এদের দু জোড়া চওড়া হালের মত হাত পা ছিল। এই হাত-পায়ের সাহায্যে এরা নদী, পুকুর বা সমুদ্রে মাছের মত সাঁতার কাটতে পারতো। এদের লেজ ছোট এবং চওড়া হত। এই জাতির কোনো কোনো প্রাণী লম্বায় ১২ মিঃ পর্যন্ত হত। কিন্তু মাথা, ঘাড় এবং হাত-পায়ের গঠনে এরা মাছের থেকে অনেক আলাদা ছিল। এদের গলা জিরাফের গলার মত লম্বা এবং সরু হত, কিন্তু মাথা খুব ছোট হত। গলা ও মাথার ভেতরে গঠনের দিক থেকে এরা অন্য সব সরীসৃপের মত ছিল। কিন্তু এদের কিছুতেই মাছের শ্রেণীতে ফেলা যায় না। আবার এদের হাতে-পায়ে মানুষের হাত-পায়ের মত অনেক ছোট ছোট হাড় ছিল। এ থেকে অনুমান, পূর্বে এরা স্থলেই বাস করত, কিন্তু পরে কোনো কারণে জলচর জীবে পরিণত হয়ে যায়। এই রকমই পরিবেশগত কারণে পরিবর্তন ঘটেছে তিমি মাছের। তিমি স্তন্যপায়ী জীব, কিন্তু এটি দানবাকৃতি মাছের মত হয়। কোন্ পরিস্থিতিতে তিমি ধীরে ধীরে স্থলচর জীব থেকে জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তা জানা যায়নি।

অসমানদন্তী সরীসৃপ

এখন বলছি সেই সব সরীসৃপের কথা যার সঙ্গে সাপ এবং স্তন্যপায়ী জীব উভয়েরই সম্পর্ক রয়েছে। এই জীবটি প্রাণীবিজ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একালের অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা, এই সব সরীসৃপ থেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

এই জাতের সরীসৃপ স্থলচর ছিল। এখনো এদের ফসিল ইয়োরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। এদেরও তৃতীয় চক্ষু ছিল, যার চিহ্ন এদের মাথার হাড়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মাথা, চোয়াল এবং কোমরের হাড় এখনকার সরীসৃপের মত। টিকটিকির আকারের বড় ঘাড়ওয়ালা গোসাপের সঙ্গেই এদের মিল বেশী। আবার স্তন্যপায়ী জীবের বৈশিষ্ট্যও এদের ফসিলে লক্ষ্য করা গেছে। সামনের এবং পিছনের পায়ের গঠনও স্তন্যপায়ী জীবেরই মতন, আবার কোমরের ও কাঁধের হাড়ের গঠন বাঘ বা চিতাবাঘের শরীরের মত।

মনে হয়, এই সরীসৃপ দুই শ্রণীর জীবেরই বৈশিষ্ট্য বহন করত। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এদের সরীসৃপ জাতিভুক্তও মনে করেন না, আবার স্তন্যপায়ী জীব হিসাবেও গ্রহণ করেন না। যতদিন না এদের কোনো সুস্পষ্ট ফসিল আবিষ্কৃত হচ্ছে ততদিন প্রাণীদের বংশধারায় এদের যুগ এবং বাস-স্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছানো সম্ভব নয়। তবে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে এ কথা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় যে স্তন্যপায়ী জীবের পূর্বপুরুষ এই ধরণের সরীসৃপের মতনই ছিল।

সাপের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ মাত্রেই সাপকে একটু অসাধারণ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এই জীব বিচিত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর শিব এবং রুদ্ররূপ পৃথিবীতে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভয়ের কারণ। কোনো কোনো সাপ সুন্দর, আবার কোনো কোনো সাপ ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এদের ঘোরানো চোখ, বিচিত্র গতি এবং প্রবল মারক শক্তির জন্য এরা মানুষের ঘৃণা ও ভয়ের পাত্র। গ্রামের লোকেরা এদের 'যমদূত' বলে ডাকে। আবার অনেকে এদের পূজাও করে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরাও এদের সৌন্দর্য ও তরঙ্গায়িত বক্রগতি দেখে প্রশংসা না করে থাকতে পারেন না। গোখরো সাপ সুন্দরভাবে নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করে এবং পুনরায় তা বিস্তৃত করে পাথরের সরু গর্তের ভিতর ঢুকে যায়। আলোতে সাপের খোলস দারুণ সুন্দর দেখায়। কোনো কোনো সাপের সুন্দর কান্তিময় দেহ দেখে চোখ জুড়োয়।

সাধারণ লোকের ধারণা, পৃথিবীর সব সাপই বুঝি বিষধর। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ১৮০০ শ্রেণীর সাপ দেখা গিয়েছে। এই বিপুল সংখ্যার মধ্যে প্রায় ১৫০০ জাতের সাপ কেবল ভারতেই পাওয়া যায়। আর এদের মধ্যে মাত্র ৬৯ জাতের সাপ বিষাক্ত। পৃথিবীর যাবতীয় সাপের মধ্যে ৩০০ জাতের সাপ বিষধর। সামুদ্রিক সাপ সবচেয়ে বিষধর।

সবচেয়ে বড় সাপ সাড়ে দশ মিটারের মত লম্বা হয়। ভারতের অজগর সাপ এই শ্রেণীর। লোকের ধারণা, সাপ দীর্ঘজীবী হয়, কিন্তু এ ধারণা ভুল। কোনো সাপই ২৫ বছরের চেয়ে বেশী বাঁচে না। সামুদ্রিক কচ্ছপ ১০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে দেখা গেছে। সাপ বোবা ও কালা হয়। সেজন্য সাপুড়ের বাঁশী সাপের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু জমির ওপর জোরে আঘাত করলে সাপ তৎক্ষণাৎ এদিকে ওদিকে পালাতে শুরু করে। সব রকমের সাপই জলে সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। প্রায় সব সাপই মাংসাশী। সাপের শরীর গোল গোল চাকার মত হাড় দিয়ে গঠিত হওয়ায় তারা তাড়াতাড়ি পালাতে পারে না এবং এদের গতি ঘণ্টায় মাইল তিনেকের বেশী হতে পারে না। কোনো কোনো সাপ ডিমের বদলে সরাসরি বাচ্চার জন্ম দেয়। বাতের রোগে সাপের বিষের ইন্‌জেকশনে খুব কাজ হয়। বিষধর সাপের বাচ্চা তার মা-বাবার মতই বিষধর হয়। সাপ খেলানো ভারত ও মিশরে আজও একটি পেশা। এর জন্য বিশেষ কোনো কৌশলের দরকার হয় না। সাপ নাচানোর চাতুর্য সাপ ধরার ওপরে নির্ভর করে। ভারতের সাপুড়েরা অজগর সাপের মোটা লেজে একটি ছিদ্র করে তার মধ্যে দুটি চোখ বানিয়ে তাকে দুমুখো সাপ বলে লোককে তাক লাগিয়ে দেয়। তারা একথাও বলে যে দুমুখো সাপ ছমাস এক মুখে এবং বাকী ছমাস অন্য মুখে খায়।

বিষধর সাপের মুখের মধ্যে দুই বা চারটি বিষদাঁত থাকে এবং একটি বিষগ্রন্থিও থাকে। সাপে কামড়ানোর সময় তার বিষ এই বিষগ্রন্থি থেকে বেরিয়ে বিষদাঁতে চলে যায়। সাপের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ভালোভাবে পড়াশোনা করলে জানা যাবে যে সাপের লালার একটি থলি থেকে নিঃসৃত রস এই বিষগ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে। আটকা পড়লে সাপ প্রায়ই খাওয়া ছেড়ে দেয়। কয়েকমাস না খেয়েও সে থাকতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় কিছু না খেলেও তার শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় এক অজগর সাপ প্রায় এক বছর ধরে কিছুই খায়নি। অবশেষে তার রক্ষক জোর করে তার মুখের মধ্যে একটি খরগোশ আর কয়েকটি ইঁদুর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সাধারণত সাপ তার শিকার সম্পূর্ণরূপে গিলে খায়। কখনো কখনো নিজের চেয়েও বড় প্রাণীকে সে গিলে ফেলে। ফলে তার খাদ্যনালী ও উদর বলের

মত ফুলে ওঠে। প্রকৃতি তাদের চোয়ালের হাড়-গুলিকে তন্তু দিয়ে পরস্পর বেঁধে দিয়েছে। উপরের এবং নীচের চোয়ালও এই রকম বাঁধা থাকে। এই তন্তুগুলির সাহায্যে দুটি চোয়ালই যথেষ্ট দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব হয়।

সাপের পরিপাকশক্তি খুব প্রবল। এদের উদরের রসে হাড়, দাঁত ইত্যাদি শক্ত পদার্থ তরল হয়ে যায়। স্তন্যপায়ী জীবের নখ এবং বন্য জন্তুর নরম লোম এই রসে তরল পদার্থে পরিণত হতে পারে না। সাপের মলে এই জিনিসগুলো দেখে এদের শিকারের বস্তুর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

একথা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে যখন সাপের মুখবিবর শিকার করা খাদ্যবস্তুতে ফুলে বলের মত হয়ে যায়, তখন সাপ কিভাবে নিঃশ্বাস নেয়। প্রকৃতি এই সমস্যার একটা সরল সমাধান করে দিয়েছে। এই কঠিন অবস্থায় সাপের শ্বাসনালীর প্রান্তভাগ তৎ-ক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে ঠোঁটের বাইরে চলে যায় এবং এইভাবে বাইরের বাতাস বিনা বাধায় ফুসফুসে পৌঁছে যায়।

সব সাপই ডিম থেকে জন্মায়। কোনো কোনো সাপের ডিম মায়ের শরীরের ভেতরেই বড় হতে থাকে এবং পরে একেবারে বাচ্চা জন্মায়। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রী-সাপ ডিম পাড়ে এবং পরে এই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। অধিকাংশ সাপ কোন গর্তে, বালির নীচে বা পচা জিনিসের মধ্যে ডিম পাড়ে এবং এই ডিমগুলো রোদের তাপে পড়ে থাকে। কোনো কোনো সাপ নিজের গোলাকৃতি শরীরের ভেতরে ডিমগুলোকে রেখে তা দেয়। কোনো কোনো সাপ একবারে একশো'র বেশী ডিম দেয়। আবার কোনো কোনো সাপ কেবলমাত্র দুটি ডিম পাড়ে। এইভাবে কিছু সাপ ৮০টিরও বেশী বাচ্চার জন্ম দেয়। আবার কোনো কোনো সাপের খুব অল্পসংখ্যক ছানা হয়।

সাপ অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় বাস করে। কিছু সাপ শীতকালের কয়েকমাস ছাড়া সারা বছরই সক্রিয় থাকে। কিন্তু শীত-ঋতুতে এরা মাটির নীচে গর্তে ঢুকে পড়ে এবং কখনো কখনো একই গর্তে অনেক সাপ পরস্পরের গায়ে লেপটে শুয়ে থাকে। এই অবস্থায় এরা অত্যন্ত অলস ও নিদ্রাপ্রিয় হয়ে পড়ে। কোনো কিছুই খায়দায় না। এই সময় এদের পরিপাক-ক্রিয়া এবং রক্ত সঞ্চালন খুব মৃদুগতিতে চলে। তখন এরাও অন্যান্য সরীসৃপের মত সারা বছর ধরে জমানো শরীরের চর্বি শুষে নেয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতে প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। এই বিপুলসংখ্যক মৃত্যুর কথা শুনে কার হৃদয় না ভয়ে ও দুঃখে কেঁপে ওঠে? আমরা আর কিছু করতে না পারি অন্তত বিষধর সাপকে মেরে ফেলার ব্যাপারে তো সাহায্য করতে পারি। গ্রামের লোকজনকে আমাদের বোঝানো দরকার যে তারা যেন সর্পপূজা বন্ধ করে দেয়। কারণ, এই পূজা কেবল অন্ধবিশ্বাসের দরুণই করা হয়। এই বিশ্বাসের ফলেই বিষধর সাপ রক্ষা পেয়ে পালিয়ে যায়। অধিকাংশ ভারতবাসীই খালি পায়ে চলাফেরা করে এবং এই কারণেই এরা সহজেই সাপের শিকার হয়ে থাকে। খুব ভালো ডাক্তার দেখানো অথবা দেশীয় চিকিৎসা সত্ত্বেও গোখরো বা কেউটে সাপ কামড়ালে মানুষ বাঁচতে পারে না। সাপের কামড় থেকে বাঁচাটা বিষের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। যদি বিষের মাত্রা কম থাকে কিংবা বিষ বিশেষ তীব্র না হয় অথবা আন্টি ভেনম ইঞ্জেকশন অবিলম্বে দেয়া হয় তা হলে মানুষ বেঁচে যেতেও পারে।

একজন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীর মতে বর্তমানে সাপের সংখ্যা অগুনতি হলেও ধীরে ধীরে সংখ্যাটা কমে আসছে। সব প্রাণীই মানুষকে ভয় পায় এবং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই বৈজ্ঞানিকের মতে, সম্ভবত এক হাজার বছর পরে সব সাপই ফসিলে পরিণত হয়ে যাবে। ঠিক যেমন বর্তমানকালে বড় বড় সামুদ্রিক সাপ ফসিল হয়ে আছে।

বিষধর সাপ

ডাক্তার সি, ফ্লেসিক্স ও তাঁর পত্নী এক পত্রিকায় লিখেছেন—সমগ্র সর্প জাতিকে (১) বিষধর ও (২) নির্বিষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় বটে, কিন্তু আমরা উভয়ে কয়েক বছর ধরে প্রত্যেক শ্রেণীর সাপের গ্রন্থি এবং নিঃসৃত লালা সম্পর্কে খুব ভাল-ভাবে গবেষণা করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কোনো সাপই সম্পূর্ণ নির্বিষ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এরকম হয়ই না। যে সাপের বিষদাঁত থাকে সেই সাপই বিষধর হয়। এমনিতে তো ঘোড়া বা বেড়ালে কামড়ালেও মানুষের মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং বিষধর সাপ তারাই যাদের বিষগ্রন্থি থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে ১৫০০ জাতির সাপ পাওয়া যায়। এরা ৯ বংশে বিভক্ত। এর মধ্যে ২৯ জাতি সামুদ্রিক, ২ জাতি গোখরো শ্রেণীর, কোরাল সাপ ৭ শ্রেণীর এবং কেউটে জাতির ১০ শ্রেণীর বিষধর সাপ রয়েছে। বাইরের চেহারা দেখে বিষধর সাপ চেনা খুব কঠিন। বিষদাঁত থাকলেই বিষ-ধর সাপকে চেনা যায়। সাপ ধরতে নিপুণ সাপুড়ে সাপের মুখ খুললে বিষদাঁত আছে কি নেই দেখতে পারে। অনেক সময় সাপের মাথা দেখেও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে দিতে পারে যে সাপটার বিষদাঁত আছে কি নেই।

বিষ দাঁতের দিক থেকে সাপকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর সাপের বিষদাঁত চোয়ালের পেছনে থাকে। এবং শেষ দুই শ্রেণীর সাপের বিষদাঁত সামনের দিকে থাকে। প্রথম শ্রেণীর সাপের বিষদাঁত একটি ছোট নড়বড়ে হাড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে। এবং তৃতীয় শ্রেণীর সাপের বিষদাঁত-গুলো বড় বড় হয় এবং চোয়ালের সামনের দিকে গাঁথা থাকে। আগে লোকে প্রথম শ্রেণীর সাপকে নির্বিষ মনে করত। কেননা এদের বিষদাঁত প্রাণী-দেহে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ এইসব সাপের বিষ থেকে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। সব সাপের বিষদাঁতে নালী থাকে। কিছু সাপ আছে যাদের একদিকে নালী থাকে। অল্প কিছু সাপ আছে যাদের দুই দিকের মাঝখানে নালী হয়। বিষদাঁত মাঝে মাঝে খসে পড়ে এবং আবার নতুন করে গজায়। এভাবে বিষধর সাপের বিষ থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

সাপের বিষ অস্বচ্ছ হয়। তার রঙ হাল্কা ধূসর বর্ণের। বিষের কোন স্বাদ হয় না। কিন্তু গোখরো সাপের বিষ লংকার মত ঝাল হয়। এই বিষ যারা খায় তারা একে পুষ্টিকর পদার্থ বলে। আরও বলে, এর থেকে হজমশক্তি বাড়ে। কারোর গলায়, মুখে বা পেটে কোন রকম আঁচড় থাকলে এই বিষ ক্ষতি-কারক হবে। এমনকি কখনো কখনো প্রাণঘাতী পর্যন্ত হয়। প্রত্যেক বিষাক্ত সাপের থলিতে অল্প বিস্তর বিষ থাকে। সাপ কোনো প্রাণীকে তিন চার বার দংশন করার পর মানুষকে কামড়ালে মানুষের দেহে বিষের প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। বিষের থলি খালি হয়ে গেলে পুনরায় ভরতে অনেক সময় নেয়। বাইরে বের করা বিষের প্রভাব পর্যন্ত থাকে। একে শুকনো করে শিশিবোতলে ভরে বহু বছর পর্যন্ত রাখতে পারা যায়। কিন্তু জলে গোলা বিষ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

নানা প্রকার সাপের কামড়ের লক্ষণ সব মানুষেরই জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক সাপের দংশনের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোখরা সাপের দংশনের প্রভাব ভাইপারের দংশন থেকে আলাদা। গোখরো সাপের দংশনে বিষের লক্ষণ দশ মিনিট থেকে দু ঘণ্টার মধ্যে বোঝা যায়। এটা বিষের পরিমাণ এবং দংশনের ভংগীর ওপর নির্ভর করে। ক্ষতস্থানে ধীরে ধীরে ব্যথা এবং জ্বালা বাড়তে থাকে। আর অল্প সময়ের মধ্যে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জায়গাটি ফুলে যায় এবং সেখান থেকে কালচে রক্ত পড়তে থাকে। সম্পূর্ণ দেহ দুর্বল

এবং শিথিল হয়ে যায় এবং রোগীর কথা বলার ক্ষমতা কমতে থাকে। তার মুখ থেকে ফেনা বের হতে থাকে। এই দুর্বলতার ফলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসও মন্থর হয়ে যায়। অবশেষে তার মৃত্যু হয়। সাধারণত গোখরো সাপের দংশনে মানুষের মৃত্যু পাঁচ থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে হয়।

রাসেল্স ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে গোখরো সাপের দংশনের সমান ফুলে যায়। ব্যথা ও বেদনা বেশী হয়। রোগী খুব তাড়াতাড়ি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তার হাত পা কিন্তু নিস্তেজ হয় না। এই সাপের দংশনে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। ঘাম বেশী মাত্রায় হয় এবং কখনও কখনও বমিও হতে থাকে। ক্ষতস্থানে পুঁজ ভরে যায়। কখনও কখনও রোগীর চামড়ার নীচে রক্ত ও জল ভরে যায়। এভাবে রোগীর বড়ই কষ্টকর মৃত্যু হয়।

কেউটে সাপের দংশনের লক্ষণ অনেকটা গোখরো সাপের মত। তবে একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে কেউটে সাপের দংশনে পেটে খুব ব্যথা হয়।

সামুদ্রিক সাপ ও গোখরো সাপের কামড়ের একই লক্ষণ। কিন্তু এই সব লক্ষণ খুবই ধীরে ধীরে বোঝা যায়। কেননা সামুদ্রিক সাপ এক বারে খুব কম বিষ বের করে।

মনে রাখা দরকার, মানুষকে সাধারণত নির্বিষ সাপই কামড়ায়। কিন্তু ভয়েই মানুষের মৃত্যু হয়।

প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে মানুষের লালা থেকে বিষাক্ত ভাইপারেরও মৃত্যু হতে পারে। বলা হয়ে থাকে, হোটেনটট জাতির মানুষের থুথু থেকে বিষাক্ত সাপের মৃত্যু হয়েছিল। আজও এ ধরনের কাহিনীকে কেউ সমর্থন করেনি। এমনও হতে পারে অরণ্যবাসীরা কোন শেকড়-বাকড় বা তামাক চিবিয়ে সেই থুথু সাপের ওপর ফেলে দিত। তার ফলে সাপের মৃত্যু হতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে এমন নিয়ম চলে আসছে যে, যেসব মানুষ সর্পসংকুল জঙ্গলে কাজ করে তারা অল্প মাত্রায় বিষ নিজের শরীরে প্রবেশ করিয়ে নেয় অথবা সামান্য পরিমাণে বিষ খেয়ে নেয়। ফলে সাপের কামড়ে তাদের ওপরে বিষের কোন প্রভাব পড়ে না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল সাহেব লিখেছিলেন যে হোটেন-টট জাতির মানুষ বিষাক্ত সাপকে ধরে তার বিষ বের করে ফেলে সে বিষ খেয়ে নেয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে টমাস সাহেব লিখেছিলেন যে আফ্রিকার সিয়ালী, ইটালীর মারসী, ভারতের গোনী এবং প্রাচীন আদি-বাসী মানুষেরা বিষের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাদের রক্তে সাপের বিষ মিশে থাকার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডুমোন্ড সাহেব সাপুড়েদের এক জাতি সম্পর্কে খুব চিত্তাকর্ষক একটা বর্ণনা দিয়ে-ছিলেন। এরা জেনেশুনে নিজেদের বিষাক্ত সাপকে দিয়ে দংশন করায় যার ফলে তাদের শরীরে কোনও বিষক্রিয়া ঘটে না এবং ধীরে ধীরে তারা সাপের বিষের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে। সীডনা ইজর এই জাতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কোন এক সময় তাঁর বহু অনুচর নিয়ে মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর অনুচরদের ক্ষিদে পায় এবং তারা খাবার জন্য চিৎকার করতে থাকে। এটা শোনামাত্র সীডনা ইজর পেছন দিকে ঘুরে আরবী ভাষায় 'কুল সিম' বলে তাদের বকুনি দেন। এই শব্দ দুটির অর্থ হলো 'বিষ খাও'। দলপতির ওপর ঐ লোকদের এমন বিশ্বাস ছিল যে সেদিন থেকে তারা বিষাক্ত সাপ খাওয়া শুরু করলো। ফলে বর্তমানে তাদের সন্তানেরা সাপের প্রভাব থেকে মুক্ত। বলা হয়ে থাকে, কয়েকটি রাজ্যের কিছু বাসিন্দা বিষাক্ত সাপকে মেরে সঙ্গে সঙ্গে তার বিষ বের করে মুখে ঢেলে দেয় এবং পান করে নেয়। এরকম চিকিৎসার ফলে তারা বিষের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে।

কলম্বোর এক পত্রিকাতে রীন সাহেব লিখে-ছিলেন—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক সাপুড়ে আমার বাঙলোতে এসে সাপ খেলা দেখাতে চাইল। আমি সাপ তো আগে অনেকবার দেখেছি। এজন্য আমার

দেখার ইচ্ছে ছিল না। দূরের জঙ্গলের এক টিলার ওপরে একটা গোখরো সাপ থাকত। আমি সেই সাপটিকে ধরবার জন্য তাকে বলি। বললাম, যদি তুমি গোখরো সাপটিকে ধরতে পারো তাহলে তোমাকে একটা টাকা দেবো। সে রাজী হল। কিন্তু যাবার আগে আমি তার সমস্ত সাপ গুনে রেখে দিলাম। তার কাপড়-চোপড় ভালোভাবে দেখে নিলাম যাতে সে সঙ্গে কোন সাপ নিয়ে যেতে না পারে। যখন আমরা সেই জায়গাটিতে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম ঐ সাপুড়ে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বড় গোখরো সাপ পিঁপড়ের গর্ত থেকে বেরোল এবং সাপুড়েকে দেখেই পালাতে গেল। কিন্তু সাপুড়ে তার লেজ ধরে ফেলল এবং উল্টোদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার বাঙলোতে নিয়ে এল। এখানে এনে সাপটাকে সে নাচালো কিন্তু সেই সময়েই সাপুড়ের হাঁটুতে সে দংশন করে। সাপুড়ে তৎক্ষণাৎ হাঁটুর ওপর দিকে শক্ত করে বাঁধল এবং ক্ষতের ওপর সাপের মণি রাখল। কিছুক্ষণ অবধি খুব ব্যথা ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ব্যথা একদম কমে গেল আর মণিটিও পড়ে গেল। সুস্থ হবার পর সাপুড়ে সাপের সামনে একটি কাপড় মেলে দিল। কাপড়টাকে ধরবার জন্য সাপ ছুটলো, আর বিষাক্ত দাঁত দিয়ে কাপড়টা কামড়ে ধরল। সাপুড়ে এই অবস্থায় পেছন দিক থেকে তার ঘাড় ধরে বিষদাঁত বের করে আমাকে দিয়ে দিল। বিষটুকু একটি পাতায় নিংড়ে দিল। সেই বিষ ছড়িয়ে গিয়ে ফেনা বের হল। এই বিষ বের করার সময় অন্য তিন ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আজকাল সাপে কামড়ানো রোগীর বিষ ছাড়ানোর এবং তাকে সুস্থ করার নানা নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। রোগীর রক্তে এ্যান্টিভেনম ইনজেকশন দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত সমস্ত বিষাক্ত সাপের বিষ এক রকমের হয় না। আর সিরামও প্রত্যেক জাতির সাপের বিষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন গোখরো সাপে কামড়ালে সেই রোগীকে গোখরো সাপের সিরামই ভালো করতে পারে। এখন অসুবিধে হল এই যে, সাপে কামড়াবার সময় সে কোন জাতির সাপ তা সনাক্ত করা কঠিন ব্যাপার। ভারতে প্রতি বছরে বিষাক্ত গোখরা ও ভাইপারের কামড়ে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। বোম্বাই-এর হফ্‌কিন ইনস্টিটিউটে সাপের বিষের সিরাম তৈরী করা হয়। গোখরো সাপ ও দাবাইয়া সাপের সিরাম প্রায় একই প্রকার হয়। সিরাম তৈরীর পদ্ধতি এই রকমঃ—খরগোশ, ঘোড়া বা অন্য কোন জন্তুর রক্তে বিষের ইনজেকশন দেওয়া হয়। প্রতি দিন অল্প মাত্রায় বিষ রক্তের সঙ্গে মেশানো হয়। কয়েক মাস পর এই সব জন্তুর ওপর বিষের প্রভাব একদম থাকে না। এর পর এদের রক্ত বের করে নেওয়া হয়। রক্ত জমাট বাঁধার পর যে জল থাকে তাকে বলা হয় সিরাম। একে অ্যান্টিভেনিনও বলা হয়। এই সিরাম ছোট ছোট কাঁচের নলে ভরে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো বায়ুশূন্য করে দেওয়া হয়। এই সব কাঁচের অ্যাম্পুল শহর এবং গ্রামে পাঠানো হয়।

বিষাক্ত সাপেদের ধরে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখা হয়। প্রত্যেকটি সাপের মুখ থেকে খুব অল্পই বিষ বেরোয়। সাপের বিষ বের করার পদ্ধতি খুবই কঠিন। সাহসী এবং শান্ত ব্যক্তিই এই কাজ করতে পারে। ইনস্টিটিউটের কর্মচারী প্রথমে সাপের শরীরে বিশেষ ধরণের লাঠি দিয়ে চাপ দেয়। ফলে সাপ নড়া-চড়া করতে পারে না। এর পর সেই কর্মী বুড়ো আঙুল ও অন্য আঙুল দিয়ে সাপের মাথা ধরে নেয় এবং সাপটিকে ওপরে তুলে একটি চামড়া বা আমেরিকার এক প্রকার কাপড়ে ঢাকা কাঁচের বাসনে রেখে দেয়। সাপকে এই কাপড়ের ওপর দংশন করানো হয়। তাদের দাঁত কাপড়ে ঢুকে যায় এবং বিষ বাসনে পড়ে। এই বিষকে শুকনো করে কসৌলি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘোড়া, খরগোস ইত্যাদি প্রাণীদের রক্তে ঐ বিষ জলের সঙ্গে গুলে ইনজেকশান দেওয়া হয়। এই সিরাম আমেরিকার থিরেসী ইনস্টিটিউটেও তৈরী করা হয়।

উত্তর-পূর্ব আমেরিকা, মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার হারলে কুইন কোরাল সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়। দৈর্ঘ্যে এরা ৬০ সেঃ মিঃ হয়। এদের দেহে কালো ডোরা ও লাল ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এদের কামড়ানোর পদ্ধতি বিচিত্র। এই সাপ খুব ধীরে ধীরে শত্রুর দিকে এগোয়। চোয়াল দিয়ে শত্রুকে খুবই জোরে ধরে থাকে। এবং অনেকক্ষণ পর ছেড়ে দেয়।

গোখরো সাপ আট রকমের হয়। বেশীর ভাগ এশিয়া ও আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। ভারতীয় গোখরো সাপের ফণাতে একটি বা দুটি গোল চিহ্ন থাকে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা গোখরো সাপ মারেন না। কোন কোন স্থানে তার পূজোও করা হয়। এঁরা গোখরো সাপের ফণার ওপর চিহ্নকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন বলে মনে করেন। এই অন্ধ বিশ্বাস অবশ্য এখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। কিছু কিছু গোখরো সাপের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মিঃ পর্যন্ত হয়। লোকের ধারণা, প্রাচীন গোখরো সাপের মণি থাকে। রাত্রিতে এই মণি বের করে তারা ছোট ছোট প্রাণীকে নিজের দিকে নিঃশ্বাস দিয়ে টেনে নেয় এবং তাদের খেয়ে ফেলে। এ ধরণের কাহিনী কিন্তু একেবারেই ভিত্তিহীন।

নাগরাজ খুবই ভয়ংকর সাপ। এই সাপ লম্বায় প্রায় ৪ মিঃ হয় এবং ভারত, বার্মা, মালয়, শ্যাম এবং চীনের দক্ষিণ ভাগে তাদের দেখা যায়। এই সাপ সর্ব-ভুকও। আফ্রিকার গোখরো সাপ থুথুফেলা সাপ নামে প্রসিদ্ধ। এই সাপেরা মুখ থেকে এক রকমের বিষের সূক্ষ্ম ধারা ফেলে। এইসব সাপকে দূর থেকে দেখেই ভয় হয়। থুথুফেলা সাপ মানুষের চোখে বিষ ফেলে। যদি সে বিষ মানুষের চোখে পড়ে যায় তো সেই চোখ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। এই সাপ প্রায় ৩ মিঃ দূরে বিষ ছুঁড়তে পারে। এই সাপের কামড়ে মানুষ বাঁচে না। এক রকমের সাপ আছে যাদের লেজে ঘন্টার মত চাকতি থাকে। সাপ যখন চলাফেরা করে সেই ঘন্টার শব্দ হয়। এদের র‍্যাটল সাপ বলা হয়। এই সাপ সম্পর্কে অনেক প্রচলিত গল্প আছে। প্রাচীনকালে র‍্যাটল সাপের বিষ থেকে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করা হত। এখনও এদের বিষ হোমিওপ্যাথি ওষুধে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা র‍্যাটল সাপের লেজের মালা পরে। কানেও ব্যবহার করে। তাদের ধারণা, এদের লেজে রোগনাশক দ্রব্যগুণ রয়েছে। এদের যাবার পথে যদি কোন সাপ পথ কেটে দেয় তাহলে এরা সেই যাত্রাকে খুবই অশুভ মনে করে। কিছু মানুষ র‍্যাটল সাপের পূজোও করে। র‍্যাটল সাপ প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং পানামাতে পাওয়া যায়। এরা দুই আড়াই মিটার অবধি লম্বা হয়। এদের বিষ গোখরো সাপ বা ভাইপারের বিষের মত তীব্র হয় না। র‍্যাটল সাপ খুবই চাপা হয়। এজন্য এদের সাপের খাঁচায় ভালোভাবে রাখা যায় না। সাধারণত এরা নিজের খাবার নিজে খেতে পারে না। এজন্য এই সাপেদের জোর করে খাওয়াতে হয়।

ত্রিনিদাদ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বুশমাষ্টার সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত ও ভয়ংকর। ব্রাজিল এবং ব্রিটিশ গায়ানাতে এই সাপ প্রায় ৪ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা বেশীর ভাগ জঙ্গলে কিংবা অন্য প্রাণীদের গর্তে বাস করতে ভালবাসে। এরা ভয় পেলেও পালায় না। এদের বিষ প্রাণঘাতী হয়। এদের বিষগ্রন্থি থেকে ৩৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ পাওয়া গেছে। এত বেশী পরিমাণে বিষ অন্য কোনো রকমের সাপের বিষগ্রন্থি থেকে পাওয়া যায় না। দূর থেকে দেখলে এই সাপ অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্রবিচিত্র মনে হয়। কিন্তু এই সাপকে ধরে রাখা যায় না। কারণ ধরা পড়লে এরা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়।

আফ্রিকার পাফএডর সাপও বড় ভয়ানক। অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ এগুলো। দেখতেও এই সাপ সুন্দর হয় না। এদের মাথা তিনকোণা, চ্যাপ্টা ও বড়। শরীর মোটা। লম্বায় এরা ১½ মিটারের মত হয়। বাস করে মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চলে। অধিকাংশ সময় গর্তের

মধ্যে থেকে শুধু মাথাটা বাইরে বের করে রাখে। ভয় পেলে শরীরকে হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে জোরে জোরে হিসহিস শব্দ করে। এই সাপে কামড়ালে এমন কি ঘোড়া পর্যন্ত দুঘন্টার মধ্যে মারা যায়। লিন্ডেকার সাহেবের মতে বন্য মানুষেরা তীরের ডগায় এই সাপের বিষ লাগিয়ে নেয় এবং সেই তীর দিয়ে তারা সহজেই জীবজন্তু মেরে ফেলতে পারে।

আফ্রিকা বিষধর সাপের জায়গা। এই মহাদেশে বিষুবরেখায় অবস্থিত সমস্ত অঞ্চল গহন অরণ্যে পরিপূর্ণ। ঘন অন্ধকারে ঢাকা এইসব বনের মধ্যে বিষধর সাপ গাছের ডালে জড়িয়ে ঝুলতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় আরো দুরকমের বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের বাহ্য আকৃতি অনেকটা পাফএডর সাপের মত, কিন্তু শরীর নানা চকচকে রং-এর ডোরা এবং নকশায় সুসজ্জিত। দেখতে এদের খুব সুন্দর লাগে। পনের বছর আগে লন্ডনের এক পশুশালায় আফ্রিকা থেকে এই জাতীয় এক সাপ পাঠানো হয়েছিল। সেটি লম্বায় দেড় মিটার এবং ওজনে প্রায় ৬ কিঃগ্রাঃ ছিল। এই জাতীয় এত বড় সাপ আজ পর্যন্ত আর পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং বলকান প্রদেশে লম্বা নাকওয়ালা ভাইপার পাওয়া গেছে এবং সাহারা ও উত্তর আফ্রিকায় শিংওয়ালা ভাইপার সাপ পাওয়া যায়। এই দুই রকম সাপেরই মাথায় শিং থাকে। প্লিনি সাহেব এই শিংওয়ালা সাপেদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, এরা গর্তের ভেতর থেকে মাথা বাইরে বের করে চারটি শিংই নাচাতে থাকে এবং এই ভাবে পাখীদের আকৃষ্ট করে। প্রকৃত পক্ষে এদের শিং মাত্র দুটিই থাকে। কিন্তু এই সব জায়গার লোকেরা শজারুর দুটি কাঁটা বের করে এদের মাথায় লাগিয়ে দেয় এবং এদের চার শিংওয়ালা ভাইপার সাপ বলে দেখায়।

কেউটে সাপের নাম সকলেই শুনে থাকবেন। এই সাপ গোখরো এবং ভাইপার সাপের চেয়েও বেশী বিষধর। কেউটে সাপ প্রধানত ভারতেই পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ কেউটেই নীল বা ডোরা-কাটা হয়। ডোরাকাটা কেউটেকে শঙ্খিনী সাপও বলা হয়ে থাকে। কেউটে সাপ সাধারণত বাড়ীর মধ্যে থাকতেই বেশী ভালবাসে। কিন্তু বিষধর হওয়া সত্ত্বেও এরা অলস। রাস্তা থেকে এরা সহজে নড়ে না। কেউ খোঁচা দিলে এরা নিজেদের গোলাকৃতি শরীরের মধ্যে মাথাকে এমনভাবে গুঁজে দেয় যেভাবে উটপাখী পালাতে গিয়ে বালির মধ্যে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

বিশাল অজগর সাপ

এছাড়া আর আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপ অজগর। বনচারী অজগর লম্বায় ১০½ মিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অজগর শত্রুকে শরীরের চাপ দিয়ে পিষে ফেলে। কোনো কোনো অজগরের শরীর মোটা মানুষের উরুর মত মোটা হয়। এদের শরীরের স্ফীতি দেখে অনুমান করা যায় এরা কত শক্তিমান। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অজগরের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তার এক দৃষ্টান্ত দময়ন্তীর কাহিনীতে আছে। যখন দময়ন্তী গভীর বনের মধ্য দিয়ে পিতৃগৃহে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ এক অজগর তার শরীরের চতুর্দিক বেষ্টন করে ফেলে। সাপটা একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল। সৌভাগ্যবশত এক ব্যাধ দময়ন্তীর কান্না শুনে এসে অজগরটির খোলা বিরাট মুখের মধ্যে তীর মারে, যার ফলে সে বৃক্ষচ্যুত হয়ে সেখানেই পড়ে প্রাণ হারায়।

মালয় দেশের ডোরাকাটা অজগর খুব লম্বা হয়। বর্মা ও ইন্দোচীনেও এই সাপ দেখতে পাওয়া যায়। হলদে, কালো ও বাদামী রঙের জালি দিয়ে এদের শরীর সুন্দর করে ঢাকা। সূর্যের আলো পড়লে এদের শরীর থেকে অনেক প্রকারের রং বিচ্ছুরিত হচ্ছে মনে হয়। তখন অজগরকে অত্যন্ত সুন্দর দখায়।

অজগর সর্বভুক সাপ। এরা পাখী, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী জীব (বন্যবরাহ পর্যন্ত) ধরে আস্ত

গিলে ফেলে। এরা বন্য মানুষের বাচ্চাদের পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। মাত্র ৯ মিটার লম্বা অজগর একটি সুস্থসবল মানুষকে নিজের শরীরের চাপে পিষে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে। ডোরাকাটা অজগর চিড়িয়াখানার বন্দীগৃহে ভালোভাবেই থাকে। কিন্তু কোনো কোনো অজগরকে জোর করে খাওয়াতে হয়। ডিটমার সাহেব জানিয়েছিন, নিউ ইয়র্কের এক অজগরকে এক বছর পর্যন্ত জোর করে খরগোশ খাওয়ানো হয়েছিল। একটি লাঠির ডগায় ছয় বা সাতটি খরগোশ বেঁধে ঐ অজগরের গলার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হত এবং পরে লাঠিটা বের করে নেওয়া হত। এক বছর বা দুবছর পরে অজগরটি নিজের থেকে খেতে আরম্ভ করেছিল।

অজগর খুব অলস ও নিদ্রাপ্রিয় হয় এবং ধীরে সুস্থে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ক্ষুধার্ত হলে এরা চটপটে হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে ফিরে শিকার ধরে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটাকে সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করে। ছোট ছোট ছাগল বা হরিণকেও এরা আস্ত গিলে ফেলতে পারে। কয়েক বছর আগে লণ্ডনের এক পশুশালায় ছাগলের বাচ্চা গিলতে গিয়ে এক অজগরের চোয়ালের হাড় সরে গিয়েছিল ফলে সে আর খেতেই পারত না। চোয়ালের সেই সরে যাওয়া হাড় ঠিকভাবে বসাবার জন্য ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। কর্মচারীরা তার মাথাটা ভাল করে ধরে রাখার পর ডাক্তার তার হাড় ঠিকভাবে বসিয়ে মুখের মধ্যে ওষুধ পুরে এক পটি বেঁধে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অজগরটি পটি ছিঁড়ে ফেললো এবং সেই সঙ্গেই মুখের মধ্যের ওষুধও পড়ে গেল। পরে আবার অপারেশন করে হাড় ঠিক করে বসানো হলো। এই বার অজগর সেরে উঠল এবং আবার ধীরে ধীরে খাওয়া দাওয়া আরম্ভ করলো।

ভারতীয় অজগর সাধারণত ৭½ মিটারের বেশী হয় না। চীনদেশেও অজগর পাওয়া গেছে। কখনো কখনো এরা বড় টিকটিকি বা কুমীরের বাচ্চাদেরও খেয়ে ফেলে। আফ্রিকার অজগর লম্বায় প্রায় ৭½ মিটারের বেশী হয় না। এই দেশের অধিবাসীরা অজগরকে মন্দিরের কাছে রেখে দেয় এবং তার পূজাও করে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনিতে ডায়মন্ড অজগর নামের এক রকম অজগর দেখা যায়। এরা ২½ মিটারের বেশী লম্বা হয় না। এদের শরীরের প্রত্যেক ছালের মধ্যে এক একটি হলদে চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

এক প্রকারের অজগরকে বোয়া বলা হয়ে থাকে। স্ত্রী বোয়ারা বাচ্চা প্রসব করে। এই জাতের বৃহত্তম সাপ দক্ষিণ আমেরিকার আনাকোন্ডা বা জলবোয়া নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে জলচর সাপের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরাজিতে প্রাচীন প্রকৃতিবিজ্ঞান অভিধানে অজগরের নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখা হয়েছেঃ—

যে কালে রোম এক সুপ্রসিদ্ধ নগর ছিল, সেই সময় টাইবার নদীর ধারে এক গুহায় ৩৮ মিঃ লম্বা এক বিশালকায় জীব বাস করতো। রেগুলাসের সৈন্যবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র এর তো কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি। বরং এই রাক্ষসটি সৈন্যবাহিনীর কয়েকটি দলকে মেরে ফেললো এবং বড় বড় গোলাতেও এর কোনো অনিষ্ট করতে পারলো না।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা বোয়ার মাংস খায় এবং বোয়া অজগরের চর্বি দিয়ে অনেক রোগ সারাবার মলমও তৈরী করে। অবশ্য বোয়ার মাংস খেতে খুব সুস্বাদু হয় না।

বিষধর সাপের বিষ নিয়ে বর্মাদেশে এক প্রচলিত রূপকথার বর্ণনা দিতে গিয়ে ম্যাসন সাহেব লিখেছেনঃ—

কথিত আছে, আগে শুধুমাত্র অজগরেরই বিষ ছিল। আধুনিক বিষধর সাপেরা অজগরের কাছ থেকেই এই বিষ আহরণ করেছে। সে সময়ে এই বিষ দুধের মত উজ্জ্বল হত। এই অজগর ঈভ নামে এক নারীকে ধরে নিজের গুহায় নিয়ে গিয়ে তাকে বলল, আমার শরীরের উপর ছবি এঁকে দাও। এই চিত্রই আজও অজগরের শরীরের ওপর দেখা

যায়। এই সাপটি এত বিষাক্ত ছিল যে রাস্তায় কোনো পথচলতি লোকের পায়ের ছাপের উপর যদি সে ছোবল মারত তাহলে সেই লোকটি সেই সময় যতদূরেই থাকুক না কেন, তৎক্ষণাৎ মরে যেত। অজগরটি নিজের চোখে এই রকমভাবে কোনো মানুষকেই তখন পর্যন্ত মরতে দেখে নি। সেজন্য সে এক কাককে বলল, গিয়ে দেখত এই পায়ের ছাপে ছোবল মারার দরুণ কোন মানুষ মরেছে কি না। কাক তখন একটি ঘরের কাছে গেল। গিয়ে দেখতে পেল অনেক লোক সেখানে নেচে নেচে খুব গান বাজনা করছে। আসলে সেই আদিম মানুষদের রীতিই ছিল কারো মৃত্যু হলে এই রকম গান বাজনা করা। কাক ফিরে গিয়ে অজগরকে জানাল, শোক করার বদলে লোকেরা সব আনন্দ উল্লাস করছে। এই কথা শুনে অজগরের ভীষণ রাগ হল। সে তখন এক গাছের উপর চড়ে নিজের সমস্ত বিষ থুথু করে ঢেলে দিল। এই বিষ অন্য সব সরীসৃপ খেয়ে ফেলল তার ফল এই দাঁড়াল যে আজও এই সব সরীসৃপ কামড়ালে মানুষ মরে যায়। যে গাছে চড়ে অজগরটি থুথু করে বিষ ফেলেছিল সে গাছটিও প্রাণনাশক বৃক্ষে পরিণত হল। এই জন্য তীরের ডগাকে বিষাক্ত করার কাজে ঐ গাছের রস ব্যবহার করা হতে লাগল। এরপর অজগরটি অন্য সাপদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করল, যতক্ষণ কোন মানুষ তোদের কোনো ক্ষতি না করে ততক্ষণ তোমরা কাউকে কামড়াবে না। এই শুনে গোখরো অজগরকে বলল, 'যদি কেউ আমাকে এই রকম বিরক্ত করে যে একদিনেই সাতবার আমার চোখের জল পড়ে তাহলে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে কামড়াবো।' চিতাবাঘ এবং অন্য জীবজন্তুরাও এই কথাই বলল। কিন্তু জলসাপ ও ব্যাঙ বললো, আমরা যাকে চাইব, তাকেই কামড়াব। এই শুনে অজগরটি তাদের জলের মধ্যে ফেলে দিল। এজন্যই তাদের বিষ জলে গুলে গেল এবং তারা সম্পূর্ণ নির্বিষ হয়ে গেল।

এই সরীসৃপ বড় বড় প্রাণীও গিলে ফেলে। প্রাচীন পুঁথিতে এদের গিলে ফেলবার শক্তির অতিরঞ্জিত বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে, একবার এক প্রকান্ড অজগর এবং এক মোষের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। অজগরটি অতি দ্রুত সেই মোষটিকে আক্রমণ করে এবং তাকে চারদিক থেকে এমন করে জড়িয়ে ধরে যে তার হাড়গোড় একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায়।

গল্প আছে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে একবার এক পলাতক অপরাধী এক গুহার মধ্যে কিছুদিন লুকিয়ে ছিল। সেই গুহার খোঁজ শুধুমাত্র তার বাবাই জানত। কখনো কখনো তার বাবা তার জন্য কিছু খাবার সেই গুহাতে নিয়ে যেত। একদিন তার বাবা গুহাতে গিয়ে তার ছেলের বদলে এক বিরাট সাপ ঘুমিয়ে থাকতে দেখল। সে তৎক্ষণাৎ অজগরটিকে মেরে ফেলল এবং তার পেটের মধ্যে নিজের ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেল।

ভারতবাসীরা সাপের অলৌকিক শক্তির অনেক বর্ণনা করেছেন। এক পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, একটি সাপ রাজা পরীক্ষিৎকে কামড়াতে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে পথে এক জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে সে নিজের শক্তির পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে এক পুষ্পিত বৃক্ষকে ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিয়েছিল। এই রকম আরো অনেক কাল্পনিক কাহিনী আছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা অবশ্য এইসব কাহিনীতে এক তিলও বিশ্বাস করেন না।

গর্তবাসী সাপ

এমন অনেক সাপ আছে যারা জীবনের বেশীর ভাগ সময় গর্তের মধ্যেই কাটায়। কেবলমাত্র বর্ষাকালেই তারা কখনো কখনো বাইরে আসে। এদের জীবনযাপনের রীতি অত্যন্ত অদ্ভুত। এই সাপেদের মাথা ধড়ের সঙ্গে কেঁচোর মাথার মত জোড়া থাকে। এদের শরীর ছোট ছোট চামড়ায় ঢাকা থাকে। সব চামড়াই এক রকমের হয়। সাধারণত অন্য সাপেদের পেটের চামড়া পিঠের চামড়ার চেয়ে বড় হয়।

গর্তবাসী সাপেদের মুখ ছোট হয়। এজন্য তারা

চোয়াল বেশী ছড়াতে পারে না। তাই শুধু ছোট ছোট কীটপতঙ্গ খেয়েই তারা জীবনধারণ করে। কেঁচো, পিঁপড়ে এবং কীটপতঙ্গই এদের মুখ্য আহার্য বস্তু। এই সাপেদের মধ্যে অনেকে চোখে দেখতে পায় না, যদিও আসলে এরা অন্ধ নয়। এদের চোখ খুব ছোট হয়। নয়ত এমন এক জাল দিয়ে ঢাকা যে এরা দেখতে পায় না। এরা ১৫ সেঃ মিটারের বেশী লম্বা হয় না। এদের দাঁতও ছোট ছোট হয়। অধিকাংশ সাপের নীচের মাড়িতে দাঁত থাকে না। আবার এমন কিছু কিছু অন্ধ সাপ দেখা যায় যাদের উপরের মাড়িতে দাঁত থাকে না। এই সব সাপ উষ্ণ গ্রীষ্ম-মন্ডলীয় (ট্রপিক্যাল) দেশে দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম আফ্রিকায় এক বিচিত্র ধরণের সাপ দেখা যায়। এর নাম ক্যালাবেরিয়া। এরা প্রায় ১ মিঃ লম্বা হয়। এদের গায়ের রঙ বাদামী এবং তার উপরে হলদে হলদে দাগ থাকে। এই সাপ সারাদিন গর্তে বিশ্রাম করে কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাইরে আসে এবং ছোট ছোট ইঁদুর ধরে খায়।

আর এক রকমের সাপ দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের বলে 'শোল্‌ড টেলস'। এদের লেজের ডগা চওড়া ও চ্যাপ্টা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকায় গোলাকৃতি এক রকম সাপ দেখা যায়। এদের শরীরের উপর লাল ও কালো রঙের লম্বা লম্বা দাগ হয়। দূর থেকে দেখলে এদের অত্যন্ত বিষাক্ত কোরল সাপের মতন মনে হয় এরা বালুকাময় স্থানে বসবাস করে। ইরিক্‌স নামের এক ধরনের বালুকানিবাসী সাপ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াতে দেখা যায়। এই সাপের সাত রকমের প্রজাতি রয়েছে। এদের সকলেরই চোখ ছোট এবং লেজ ছোট ও চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। ভারতীয় ইরিক্‌স সকলের চেয়ে বড় হয়, কিন্তু সাধারণত এদের দৈর্ঘ্য ১ মিটারের বেশী হয় না।

এই ধরণের সব সাপই বিষহীন। ভারতীয় সাপুড়েরা এদের দুমুখো সাপ বলে। তারা এই সাপের লেজের শেষদিকে একটা ফুটো করে সেটাকে এই সাপের দ্বিতীয় মুখ বলে চালায় এবং লোকদের প্রতারিত করে বেড়ায়।

শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভগবান এই নির্বিষ সাপেদের অনেক উপায় করে দিয়েছেন। যখন কোন শত্রু এদের ধরতে আসে তখন এরা গোখরো সাপের মত মাথা তুলে হিস হিস শব্দ করতে থাকে। এই কৌশল ব্যর্থ হলে তৎক্ষণাৎ এরা মাটিতে পড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে চলতে থাকে। তখন এদের গতি ধীর থেকে ধীরতর হতে থাকে। দূর থেকে মনে হয়, এরা বোধ হয় মারা যাচ্ছে। শেষকালে হঠাৎ এরা উল্টে যায় এবং মাটিতে পিঠ রেখে চুপচাপ পড়ে থাকে। তখন শত্রুর বিশ্বাস হয়, এরা সত্যি মারা গেছে।

জলচর সাপ

সব সাপই জলে সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু কোন কোন সাপ আছে যারা অনেকক্ষণ ধরে জলের ভেতর থাকতে পারে। এই জলসাপদের মধ্যে আনা-কোন্ডা বা জলচর অজগর সবচেয়ে বড় হয়। এই সাপ প্রধানত ব্রাজিল, পেরু এবং গায়ানা দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এদের সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

হর্দিবগ সাহেব জানিয়েছেন, এই ভয়ানক সাপ আরোহী সমেত ঘোড়াকে আস্ত গিলে খায় কিংবা শিং সমেত একটি আস্ত বলদকে গিলে খেতে পারে। স্পেন দেশের অধিবাসীরা বলে যে এরা প্রায় ২৪ই মিঃ লম্বা হয়। তারা এদের 'মটায়োরা' অর্থাৎ 'বলদখেকো সাপ' বলে।

আসলে জলচর অজগর ৯ মিটারের বেশী লম্বা হয় না। সামুদ্রিক সাপ বাদ দিলে অন্য যে কোন জলচর সাপের তুলনায় আনাকোন্ডা বা জলচর অজগর জলের মধ্যেই বেশীক্ষণ থাকতে ভালবাসে। এরা জলের উপর মাথাটা ভাসিয়ে শুয়ে থাকে।

কখনো কখনো এরা জলে সুন্দরভাবে সাঁতার কাটে। আবার কখনো জলের ধারে গাছের ডাল পেচিয়ে থাকে। এই অবস্থায় এরা শিকারের খোঁজে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। এই সময়ে যদি কোন হতভাগ্য বুনো শুয়োর জলের তেষ্টায় ওখানে যায় তাহলে সে সাপটির কবলে পড়ে।

আসলে আনাকোন্ডা সাধারণত পাখীই খায়। আনাকোন্ডা আস্ত একটা কুমীর গিলে খেয়েছে বলেও শোনা গেছে। কখনো কখনো মানুষও এদের শিকার হয়েছে। এই কারণেই এদের আশেপাশে যে সব মানুষ বাস করে তারা এদের ভীষণ ভয় পায় এবং সেসব জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

অথচ আশ্চর্যের কথা, এই সাপের বিষ নেই। আর এ জন্যেই এরা শিকারকে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলে। লন্ডনের পশুশালায় এই সাপ কখনো সখনো দেখতে পাওয়া যায়। এই পশুশালাতে ১৯১৩ খৃীষ্টাব্দে এক স্ত্রীসাপ একসঙ্গে চারটি বাচ্চা দিয়েছিল। বাচ্চাগুলোর প্রত্যেকটি ১ মিঃ লম্বা ছিল।

জলসাপ অনেক শ্রেণীর হয়। এদের মধ্যে এক-রকম সাপ শুঁড়ের মত হওয়ায় তাকে শুঁড় সাপ বলা হয়। এই জাতির সাপ জাভা, নিউগিনি এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জেই বেশীর ভাগ দেখা যায়। শ্যাম দেশের অধিবাসীরা ঢোল বানাবার জন্যে এই সাপের চামড়া ব্যবহার করে। জলচর সাপের মধ্যে সামুদ্রিক সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়। এই সাপ সচরাচর ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়। ডঃ থিয়োডোর কানটোর এই সাপের বিষের তীব্রতা নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর মতে, এই সাপে কামড়ালে মুর্গী আট মিনিটে, মাছ দশ মিনিটে, কচ্ছপ কুড়ি মিনিটে এবং ঢোঁড়া সাপ আধ ঘন্টা পরে মারা যায়। স্যার জোসেফ ফায়ার জানিয়েছেন, এই সাপে কামড়াবার পর এক জেলে দেড় ঘন্টা বাদে মারা গিয়েছিল। সামুদ্রিক সাপের কামড়ের রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। জল থেকে উঠেই আশপাশের বস্তুতে এরা প্রচন্ড কামড় বসায়। সামুদ্রিক সাপ ৩ মিঃ বা ততোধিক লম্বা হয়। এদের লেজ নৌকার হালের মতন চওড়া হয়। এদের নাক থাকে মাথার ওপরে। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে দুটি ঢাকনার মতো থাকে এবং যেই সাপ জলের মধ্যে ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

সামুদ্রিক সাপের চোখ খুব ছোট হয় এবং জলের বাইরে চোখের মণিগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কড়া রোদে এদের চোখ ধাঁধায়। বেশীর ভাগ সামুদ্রিক সাপের পেটের উপর খুব ছোট ছোট ছাল থাকে। এরা একবারে খোলস ছাড়ে না। খোলসগুলো ধীরে ধীরে বের হতে থাকে।

এই জাতীয় সব সাপই বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রীসাপ কোনো বড় পাথরের চাঁই-এর এক প্রান্তে বাচ্চা প্রসব করে এবং সেই শাবকদের চারপাশে কুন্ডলী পাকিয়ে কিছুদিন বসে থাকে। এইভাবে সে বাচ্চাদের রক্ষা করে। এই সাপকে জীবিতাবস্থায় ধরা খুব কঠিন।

পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি পুস্তকে এক বিশাল সামুদ্রিক সাপের বর্ণনা রয়েছে। নরওয়ে দেশের প্রাচীন লোক কাহিনী অনুসারে এক অতিকায় সাপ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। অনেকটা আমাদের পুরাণে বর্ণিত বাসুকীর মত। এক গ্রন্থে বর্ণনা আছে, এই সাপের পিঠ জলের উপর এইভাবে আছে যে মনে হয় সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ ছড়িয়ে আছে। পিঠের পরিধি প্রায় ৪ কিঃ মিটার। কোথাও কোথাও মনে হয় উঁচু টিলার মত। এই ঢিবির ওপর ছোট ছোট মাছ লাফালাফি করছে আবার পরক্ষণেই জলে সাঁতার কাটছে বলে মনে হয়। পেছনের দিকে শিং-এর মত উঁচু কয়েকটি তীক্ষ্ম অগ্রভাগ আছে যাদের বাইরের অংশগুলি চওড়া ও মোটা। এগুলি ছোট ছোট জাহাজের মাস্তুলের সমান উঁচু। অনুমান করা হয় এগুলো এই সাপের হাত। শোনা যায় কোন

যুদ্ধজাহাজ ধরতে পারলে তৎক্ষণাৎ সেটিকে সে সমুদ্রের তলদেশে টেনে নিয়ে যায়।

পাদ্রী পেন্টোপিডান আর এক প্রকারের সামুদ্রিক সাপের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই সাপ ১৮০ মিটারের মত লম্বা হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে দেশের তটভূমিতে এই রকম সাপ দেখা গিয়েছিল। এই রকম অতিকায় সাপের বর্ণনা অনেক পন্ডিতের লেখাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এরকম জীবের কোন সন্ধান পাননি। অধিকাংশ পন্ডিতের মতে এরূপ জীবের অস্তিত্ব শুধু বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে অসবোর্ন জাহাজের ক্যাপ্টেন সিসিলি দ্বীপের সৈকতে এক বিশাল সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে পান। দূরবীণের সাহায্যে ক্যাপ্টেন ঐ প্রাণীটিকে লক্ষ্য করেন। তিনি দেখতে পান, প্রাণী-টির মাথা অত্যন্ত বিরাট এবং ডানাও সুবিশাল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গীরাও এই প্রাণীকে দেখেন। তাঁদের বক্তব্য, এর ডানা ৯ মিঃ লম্বা এবং প্রায় ২ মিঃ উঁচু। কিন্তু কেউই উল্লেখ করেন নি যে এটি কোন্ প্রাণী, কিংবা কোন্ জাতির বা শ্রেণীর জীব।

গেছো সাপ

গেছো সাপ অনেক রকমের হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ গাছের ডালে ডালেই চড়ে বেড়ায়। কখনও নীচে নামে না। এদের মধ্যে আবার কতকগুলো এমন সাপও আছে যারা ঝোপঝাড়ে এবং ছোট ছোট চারাগাছের ওপরেও ঘুরে বেড়ায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এক বিচিত্র শ্রেণীর সাপ দেখা যায়। এদের শরীর খুব পাতলা হয় এবং এরা ঘাসপাতার মধ্যেই মিশে থাকে। বেশীর ভাগ কোড়েদার সাপ সবুজ রঙের হয়। সবুজ ঘাসের মধ্যে এদের আলাদা করে চেনা যায় না। কোন কোন পন্ডিতের মতে এরা খুব শান্ত। কিন্তু অন্য অনেকের মতে এরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জীব। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা কখনও বা এদের নিতান্ত শান্ত প্রকৃতির জীব হিসেবে দেখেছেন আবার অন্য সময় এদের ভয়ঙ্কর রূপ লক্ষ্য করেছেন। এ'দের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সাপ মাঝে মাঝে নিজের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে।

একবার বেরিজ সাহেব এক সাপুড়ের অনুমতি-ক্রমে তার ঝুড়ির মধ্যে থেকে এই রকম একটা সাপ বের করে তাকে একটা ঝোপের উপর রেখে দিয়ে তার ফোটো নেবার জন্যে ক্যামেরা ঠিক করছিলেন। তখন পর্যন্ত সাপটা খুব শান্তশিষ্ট ছিল। কিন্তু যেই সাহেব ঝোপের কাছে গেলেন, সে ভীষণাকৃতি ধারণ করল এবং মুখ হাঁ করে ফেলল। বেরিজ সাহেব ফোটো তো তুলে নিলেন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল কি করে সাপটাকে পুনরায় ঝুড়ির মধ্যে ঢোকানো যায়। কেউই তাকে ধরতে পারলনা। ওর খোলা মুখ দেখে সকলে ভয় পেয়ে গেলো। অবশেষে একটি লাঠির সাহায্যে তাকে চুবড়ির মধ্যে পোরা গেল।

লাউসন এই সাপের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এরা শস্যক্ষেত্রে গিয়ে শস্যনাশক সমস্ত জীবজন্তু খেয়ে ফেলে। এমনকি এরা র‍্যাট্‌ল সাপের ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের মেরে ফেলে। যদি কেউ এই সাপের পিছু নেয় তাহলে এরা অবিলম্বে গাছে চড়ে যায় এবং কোন গর্তে মাথা ঢুকিয়ে রাখে। এই অবস্থায় যদি কেউ এদের টানাটানি করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এদের শরীর মাঝখান থেকে দুটুকরো হয়ে যায়। আশ্চর্যের কথা, কোন কোন সাপ উড়তেও পারে। দক্ষিণ ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য ভাগে উড়ন্ত সাপ দেখা যায়। এরা এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডাল পর্যন্ত উড়ে যায়। ওড়ার সময়ে এরা শরীরকে সোজা রাখে এবং পেটের কাছটা একটু সঙ্কুচিত করে নেয় যার ফলে এদের শরীরটা খিলানের আকার ধারণ করে। এরা বেঁকে নীচের দিকে ওড়ে। মেজর ফুলাবর এইরকম একটি সাপকে এক বাড়ীর ওপরের জানালা থেকে ২½ মিঃ দূরের এক গাছের ডালের উপর লাফিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

উড়ন্ত সাপ দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এই সাপ নানা রঙের হয়। এদের শরীর ঘন সবুজ রঙের হয়। তার উপর হলদে, লাল এবং কমলালেবুর রঙের চিহ্ন থাকে।

ওপরে যে সব উড়ন্ত সাপের কথা বলা হল সেগুলো সবই বিষহীন। বুম স্ল্যাংগ, সবুজ মাম্বা এবং কির্কল্যান্ড বিষাক্ত গেছো সাপ। বুম স্ল্যাংগ সাপ ১½ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার উষ্ণ প্রদেশে দেখা যায়। এক সময় লোকেরা এই সাপকে বিষহীন মনে করত এবং লন্ডনের পশু-শালায় রক্ষিত এই সাপকে হাতের উপর তুলত। কিন্তু পরীক্ষা করে এখন জানা গেছে যে এরা বিষাক্ত। এদের বিষদাঁত ছোট হলেও ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবন-সংহারের পক্ষে এদের বিষ যথেষ্ট তীব্র। এমন কি মানুষের পক্ষেও এই সাপের বিষ প্রাণঘাতী। কয়েক বছর আগে এই রকম এক সাপ একজন লোকের হাতে কামড়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোক-টির শরীরে বিষ সংক্রামিত হতে আরম্ভ করল এবং প্রতি মিনিটে রোগীর অবস্থা ক্রমশই খারাপ হ'তে লাগল। এমন কি তৃতীয় দিনে ডাক্তাররা রোগীর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। তবে সৌভাগ্যবশত রোগী কোন রকমে বেঁচে গেল এবং তিন মাস পরে সুস্থ হয়ে উঠল।

বুম স্ল্যাংগ সাপকে বিরক্ত করলে সে নিজের ঘাড়গলা ফুলিয়ে আততায়ীকে ভয় দেখায়। এই সাপের বিষদাঁত থাকে না। কিন্তু লোকে এদের বিষাক্ত মনে করে। কারণ আক্রমণ করার সময় এরা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে এবং কখনো কখনো কামড়েও দেয়। এদের শরীরের রং খয়েরী হয়। বহিরা-কৃতিতে এরা কোড়েদার সাপেরই মত এবং চট করে এদের পার্থক্য ধরা যায়না। এজন্য ঝোপঝাড় গাছ-পালার মধ্যে এদের শীঘ্র চেনা যায় না। সবুজ মাম্বা অত্যন্ত বিষাক্ত হয়। এদের বেশীর ভাগই দক্ষিণ ও উষ্ণ আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। এরা ৩ মিঃ লম্বা হয় এবং এই দেশের অধিবাসীরা এই সাপের ভয়ঙ্কর ক্ষমতার জন্য এদের খুব ভয় করে। এদের কাছে কখনো যায়না। এদেশের বাসিন্দাদের এরকম অন্ধবিশ্বাস আছে যে যদি এরা একটি মাম্বাকেও মেরে ফেলে তাহলে সর্পদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। এই কারণে এরা এই জাতীয় সর্পকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। অন্যান্য সাপের মতই মাম্বা সাপও মানুষকে কাছে আসতে দেখলে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং কামড়াবার জন্যে পিছনে ছোটে। এদের দ্রুত গতি থেকে অনুমান করা যায় এদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি কত তীব্র। এই সাপে কামড়ালে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এই জন্য এদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে খুব দ্রুত পালাতে হয়।

ডিম-খেকো ডেসোটেলটিস এক অদ্ভুত ধরণের গেছো সাপ। গ্রীষ্মপ্রধান দক্ষিণ আফ্রিকাতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা মাত্র ৬০ সেঃ মিঃ লম্বা হয়, কিন্তু এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন বড় বিচিত্র। কারো কারোর কয়েকটি দাঁত থাকে গলার মধ্যে। এগুলোকে বলে থ্রোট টীথ। এরা পাখীর ডিম খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের দাঁত খুব ছোট ছোট। সংখ্যায়ও অল্প। এরা পাখীর ডিম আস্ত গিলে খায়। ডিমগুলো গলা পর্যন্ত পৌঁছালে ঐ 'থ্রোট টীথ' বা গলার দাঁত সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে। তখন ডিমের রস পেটের মধ্যে চলে যায় এবং খোসা-গুলিকে এরা মুখ দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। সাধারণত এরা পাখীর ডিমের ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু পাখীর ডিম জোটাতে না পারলে এই সাপ কাছাকাছি গোলাবাড়ীতে চলে যায় এবং মুরগীর ডিম খেয়ে পেট ভরায়।

নিজের মুখের আকারের চেয়েও বড় আকারের ডিম এরা গিলতে পারে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একজন লোক ফুটবল গিলে ফেলছে। 'থ্রোট টীথ' পর্যন্ত ডিম পৌঁছবার আগে এদের গলা এত ফুলে যায় যে ভয় হয়, গলা বুঝি ফেটে যাবে।

সাপের শত্রু

সাপের শত্রু অনেক। শুধু মানুষই নয়, অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব এবং পাখীরাও এদের মারে। এমনকি এদের কিছু কিছু বিজাতীয় স্বজনও পরস্পর পরস্পরকে খেয়ে ফেলে। এমনও শোনা যায় ছোট ছোট পিঁপড়েরাও সাপকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে।

বেজী সাপের বড় শত্রু। বেজী খুব চতুর এবং আক্রমণের সময়ে এরা অত্যন্ত উগ্রমূর্তি ধারণ করে। বলা হয়ে থাকে, বেজীর ওপরে সাপের বিষ প্রভাবশূন্য। আধুনিককালে বেজীর শরীরে সাপের বিষ প্রয়োগ করার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, কোন বিষাক্ত সাপ বেজীর শরীরে ভালোরকম কামড় বসাতে পারলে সেই বেজী বাঁচে না। তবে বেজীকে সাপ কামড়াতেই পারে না। কেননা বেজীর গতি এত দ্রুত হয় যে সাপ তাকে কামড়াবার সুযোগই করে উঠতে পারে না। ভারতীয়দের এরকম একটা অন্ধবিশ্বাস আছে যে যখন সাপ বেজীকে কামড়ায় তখন বেজীটি কোনো গাছগাছড়ার শেকড় খেয়ে নেয়। কিন্তু তা সত্যি নয়। অহিনকুলের যুদ্ধ তো সর্বজনবিদিত। অনেক লেখকই এর বর্ণনা দিয়েছেন। সকলেরই অভিমত এই যে বেজী অত্যন্ত চালাক এবং সর্বদা নিজের চাতুর্যে সাপের বিষ থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থ। বেজী সাপের চারদিকে ছোটাছুটি করে এবং সুযোগ পেলেই সাপকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিছুক্ষণ পরে সাপটা ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বেজী কিন্তু তখনও সাপটার থেকে বেশ দূরেই থাকে। মিশর দেশের বেজী অত্যন্ত অদ্ভুত হয়। সেদেশে বেজীকে বলে 'ইকুইমোন'। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা বেজীকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। কারণ তারা কুমীরের ডিম খেয়ে ফেলত এবং এইভাবে কুমীরের সংখ্যা বাড়তে পারত না। মিশর দেশের প্রাচীন চিত্রগুলির মধ্যে বেজীর ছবি পাওয়া গেছে। হেরোডোটাসের মতে এই বেজীগুলোর মৃতদেহ মিশরের পবিত্র স্থানে সমাহিত করা হত।

শজারুরা সাপ খায়। বিষাক্ত সাপের পক্ষে শজারুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। শজারুর উপর বিষের কোনো প্রভাব পড়ে না বলে শোনা যায়। জীববিজ্ঞানীরা এদের শরীর সম্বন্ধে ভালোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে শজারুও বেজীর মতন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাপকে মেরে ফেলে এবং তাকে কামড়াবার অবসরই দেয় না। শজারু কোন সাপকে দেখতে পেলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে তার খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে সরে যায়। সে তখন তার মুখ শরীরের মধ্যে গুঁজে অপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে সাপটা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কামড়াতে যায়। কিন্তু শজারুর তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটার খোচা খেয়ে চুপ করে ফিরে আসে। শজারু এই সময় আবার মাথা তুলে দৌড়ে এসে সাপকে কামড় দেয়। এইভাবে তিন চারবার কামড়েই সাপটা মারা যায়।

দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকায় এক প্রকার স্তন্যপায়ী জীব আছে। এদের বলে আরমিডিলো। এরাও সাপের শত্রু। এদের দেহ এক বৃহৎ বর্মের দ্বারা আবৃত থাকে যার ফলে সাপ এদের কামড়াতে পারে না। এরা এদের ধারালো দাঁত দিয়ে সাপকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

আফ্রিকাতে জোরিলা নামের এক ক্ষুদ্রকায় প্রাণী আছে। এদের আকার খরগোশের মতন এবং এদের শরীর সাদা ও কালো লোমে ঢাকা থাকে। গোখরো সাপ এবং পাফ্‌এডর সাপের এরা বড় শত্রু। আক্রমণ করার সময়ে কিন্তু জোরিলা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকে বলে মনে হয়। বন্যবরাহও সাপ খেয়ে ফেলে।
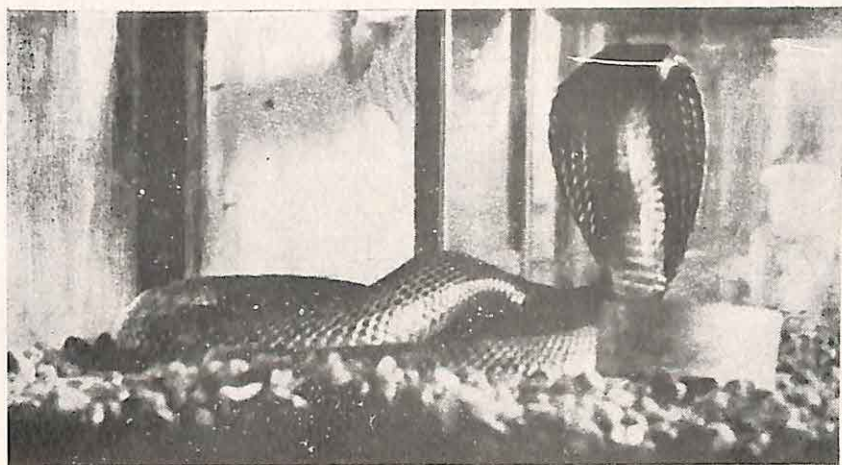
গোখরো সাপ ফণা তুলে
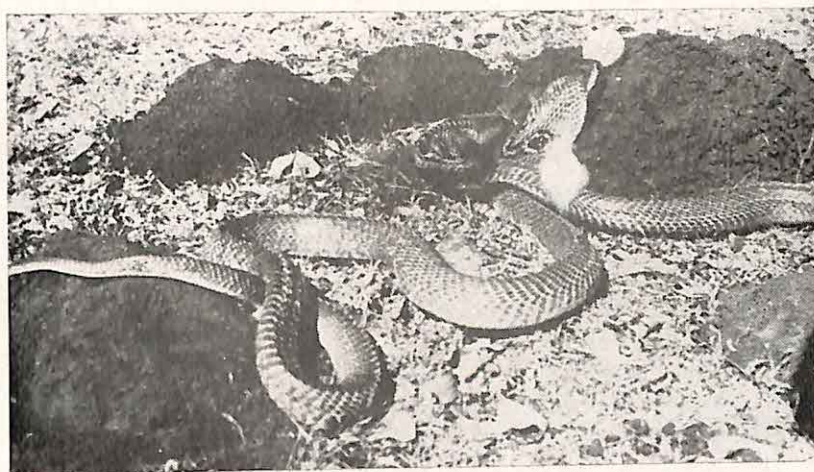
গোখরো সাপ
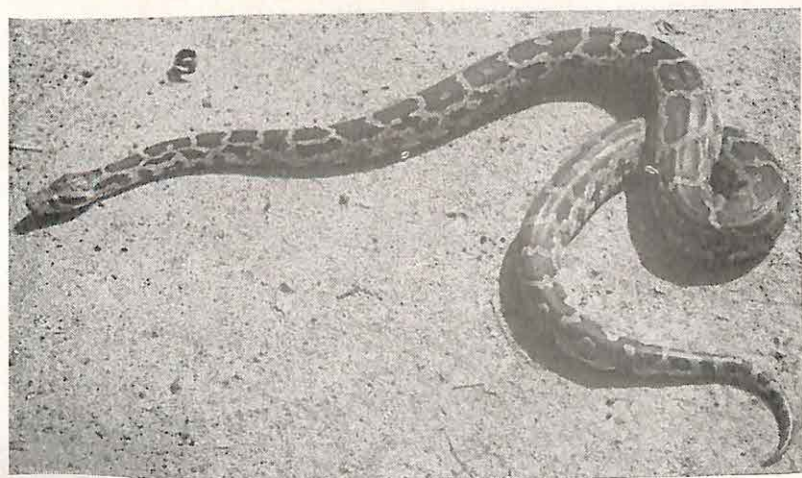
ডোরাকাটা সাপ
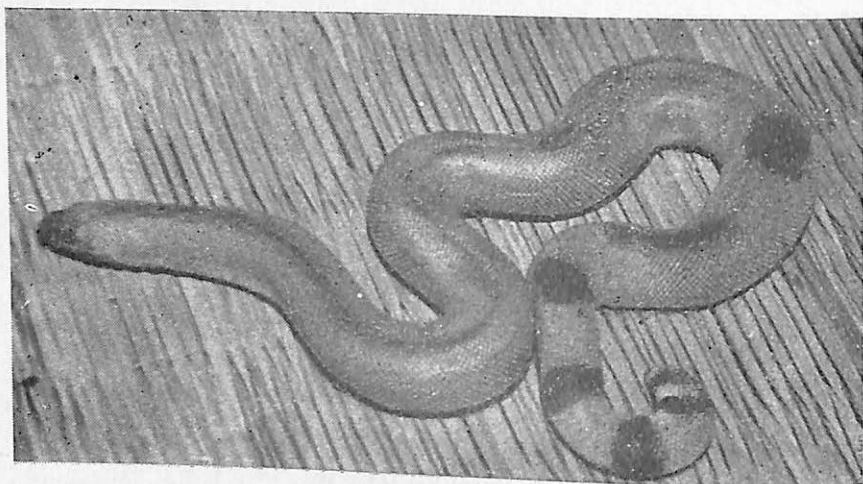
জলচর সাপ

কেপ ভাইপার সাপ
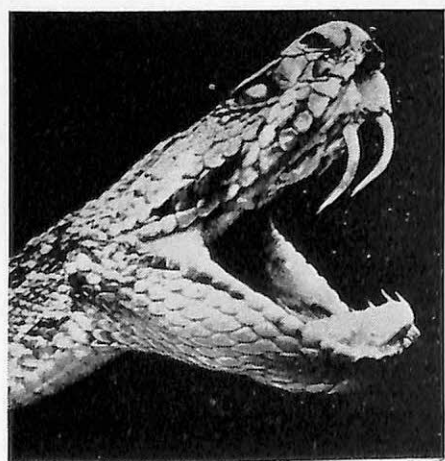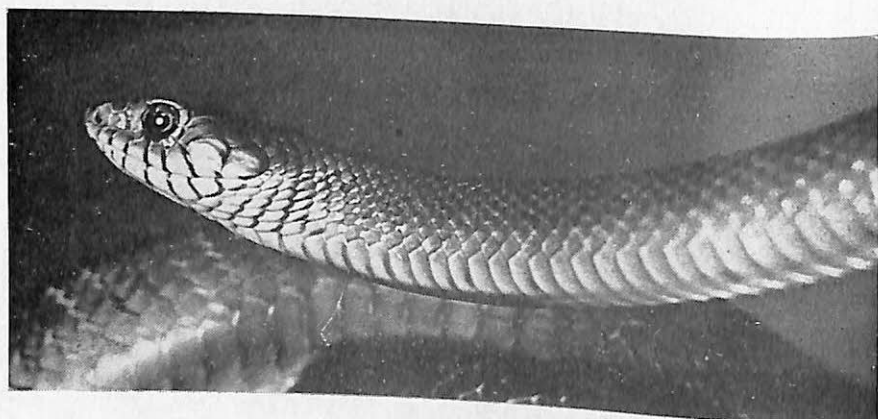
ভাইপারের বিষদাঁত
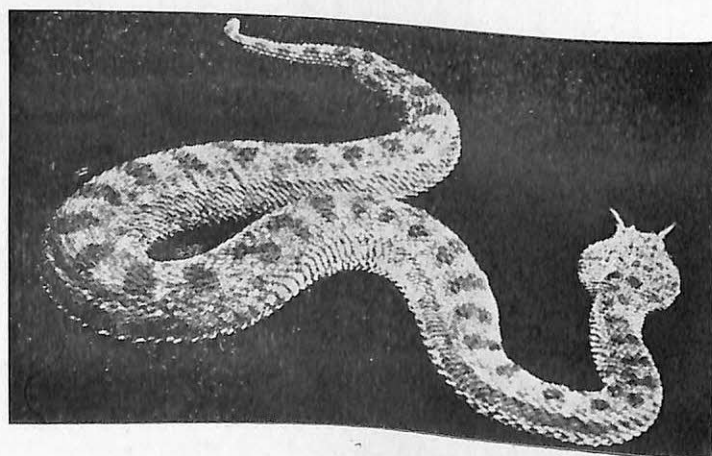
শিংওয়ালা সাপ (ভাইপার)
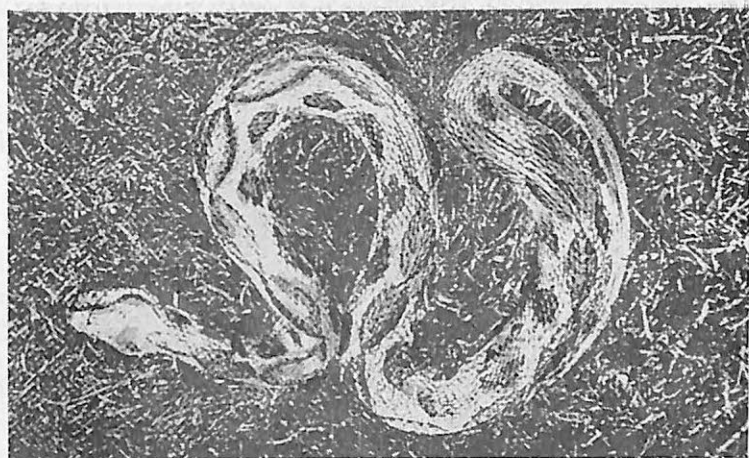
বিষধর সাপ

সাপে ব্যাঙ ধরেছে
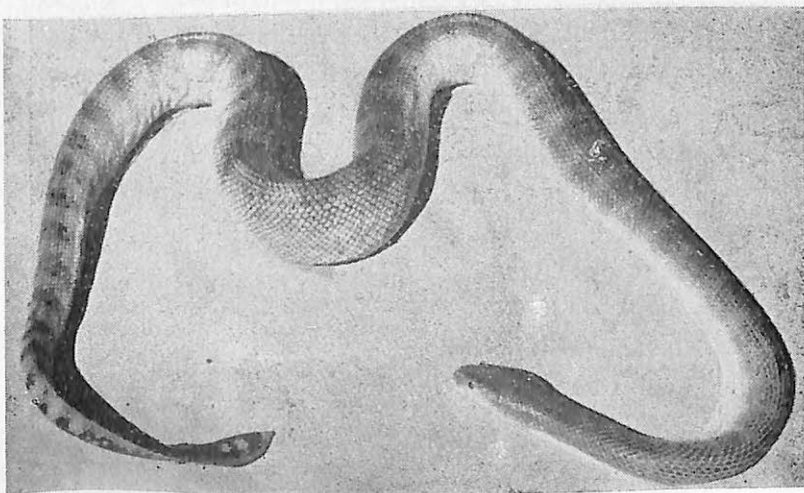
জলচর সাপ

সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে
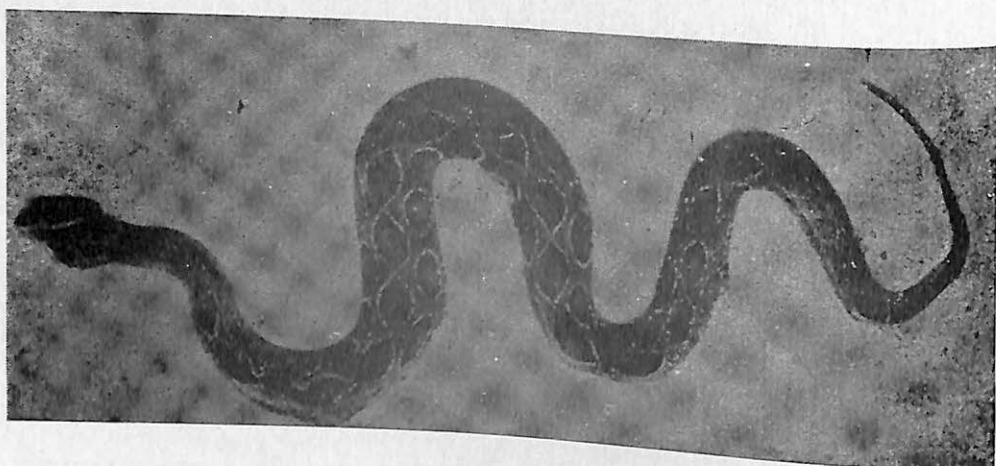
দক্ষিণ আমেরিকাবাসী সাপ
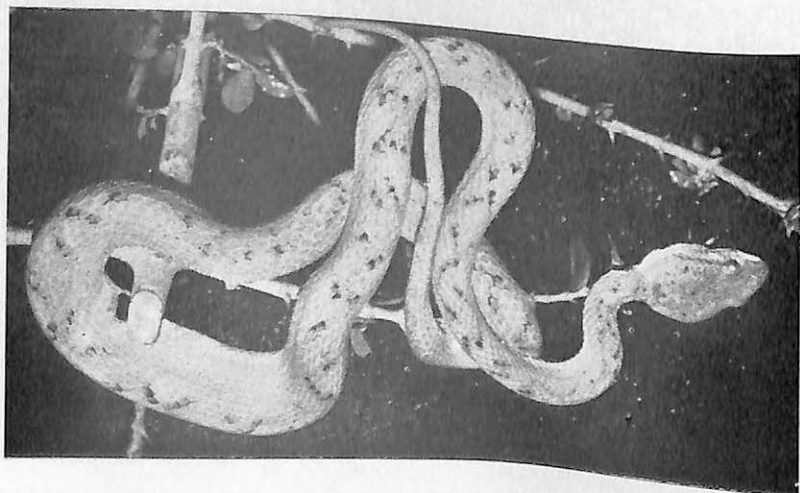
গেছো সাপ
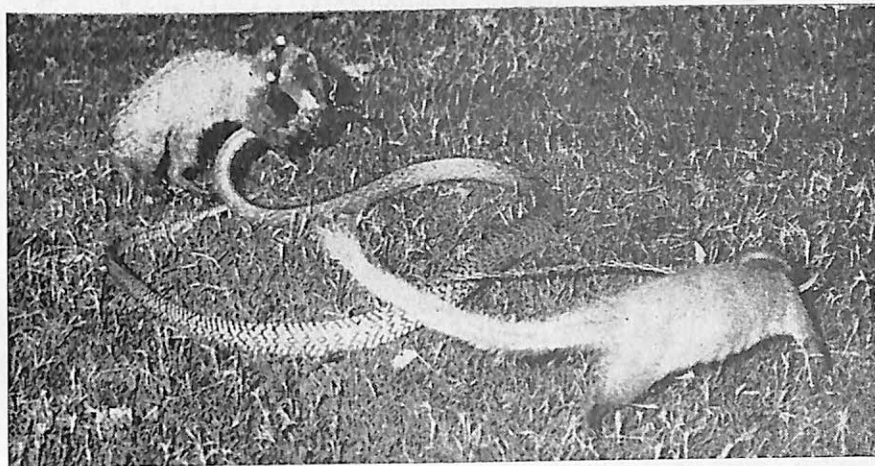
বেজী সাপের মুখ কামড়ে ধরেছে
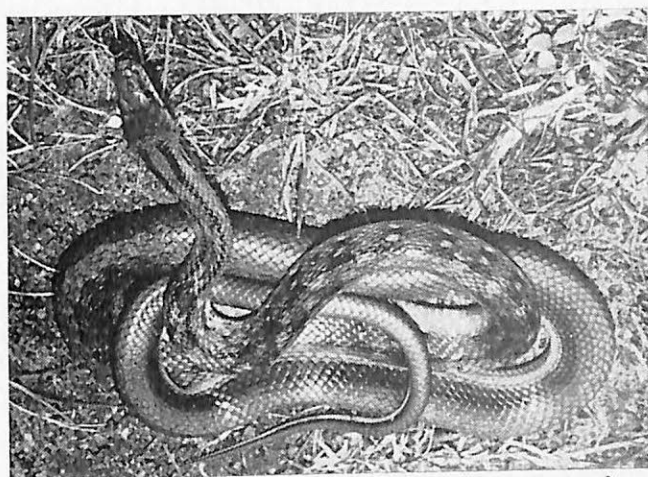
কাদার সাপ
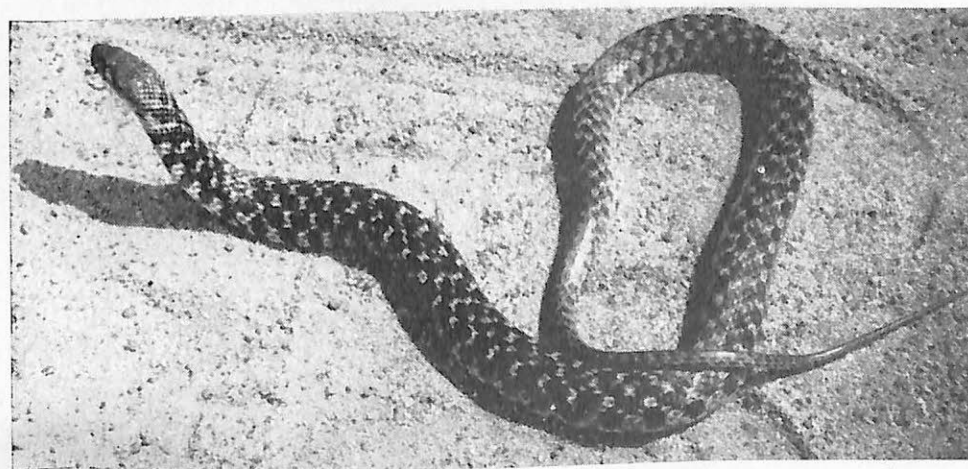
আমেরিকার র‍্যাটল সাপ
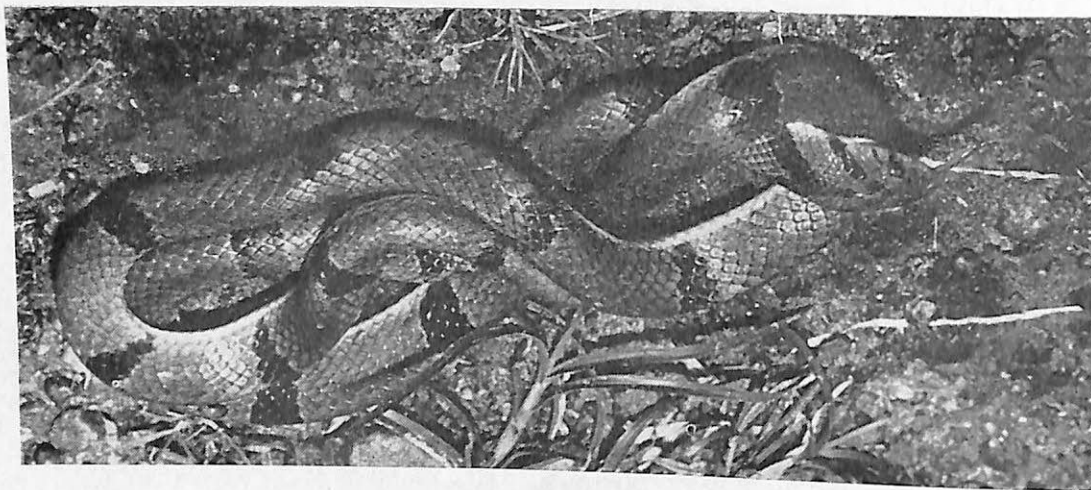
আফ্রিকার অজগর
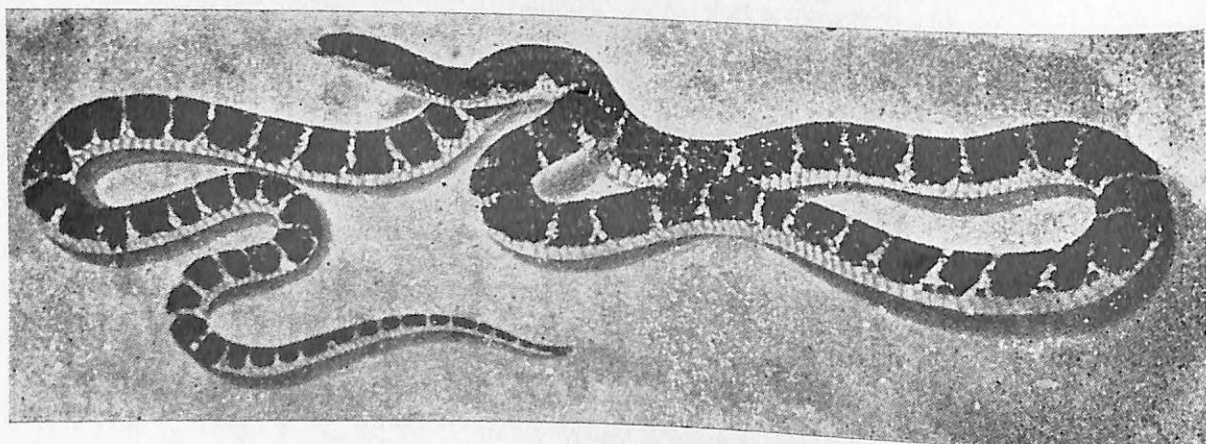
মার্কিনী অজগর
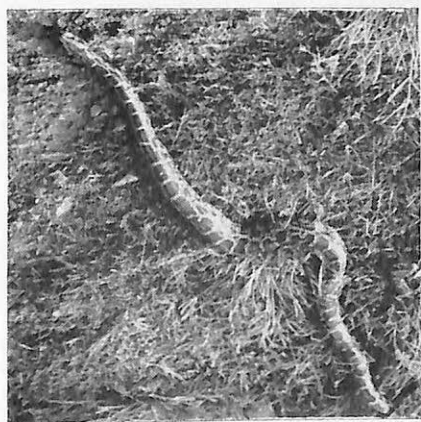
শৈলবাসী সর্প
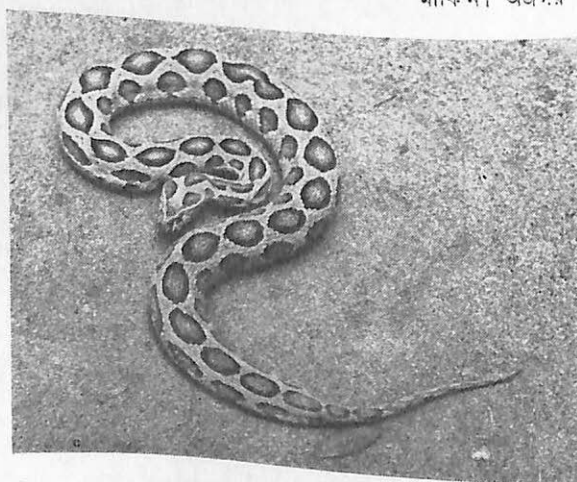
বিষধর পাফএডর সাপ
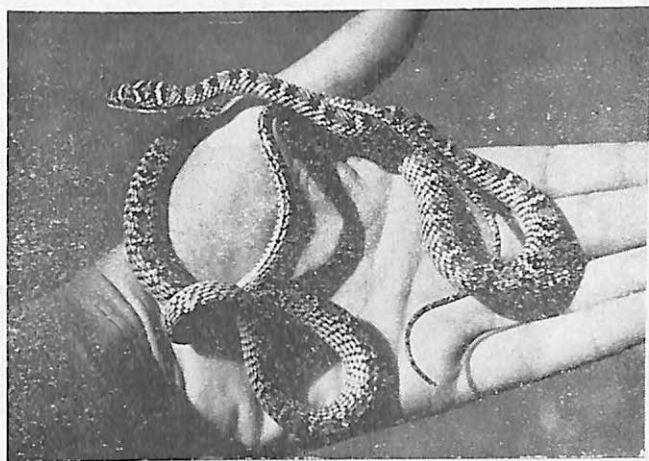
বালির বিষধর সাপ

আফ্রিকান সাপ
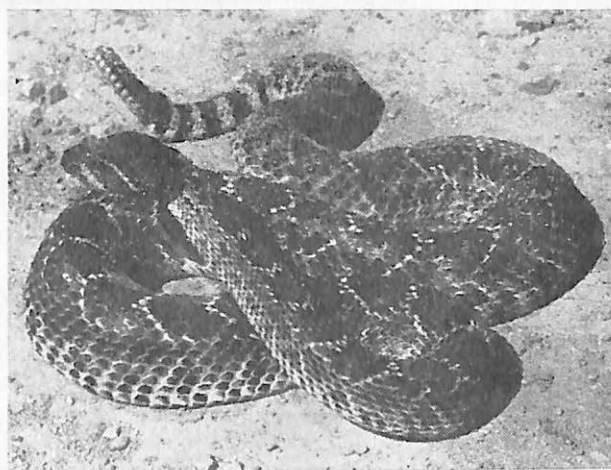
জলচর সাপ
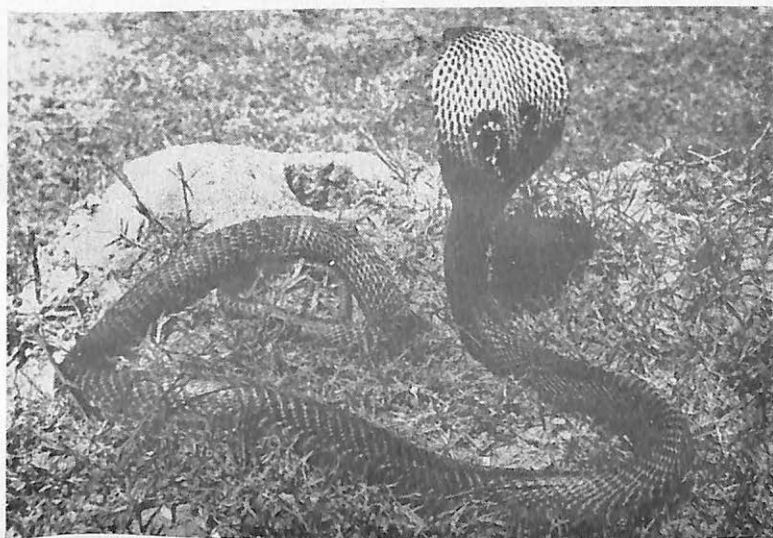
গোখরার ফণা
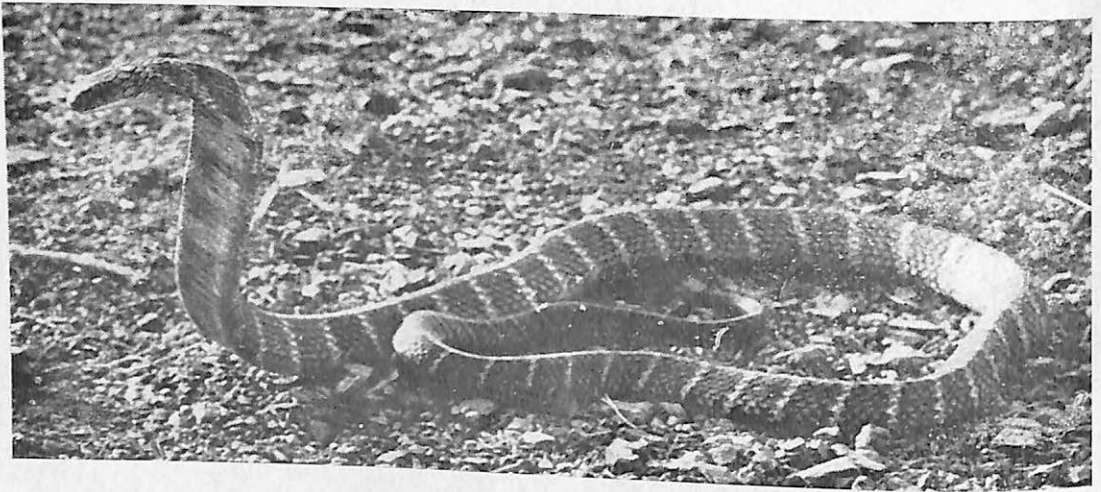
রেগিস্তানী সাপ
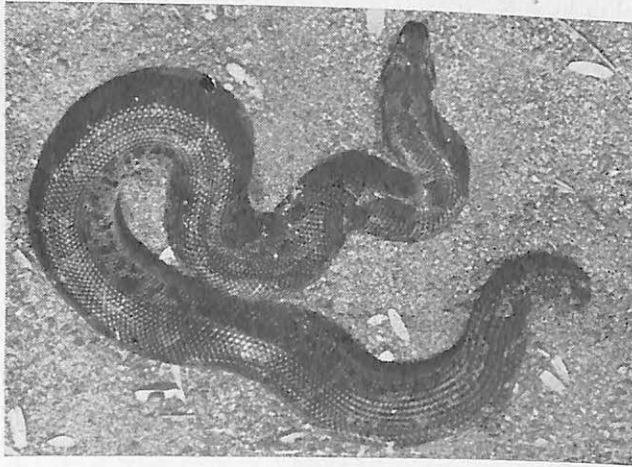
মার্কিন জলচর সাপ

গর্তবাসী সাপ
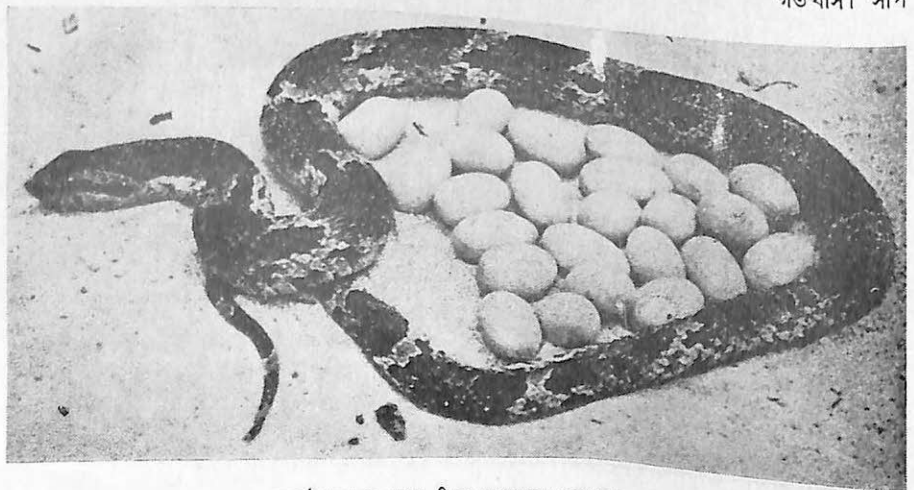
চ্যাপ্টা-মুখো সাপ ডিম আগ্‌লে রেখেছে

গলায় ঝালরযুক্ত টিকটিকি
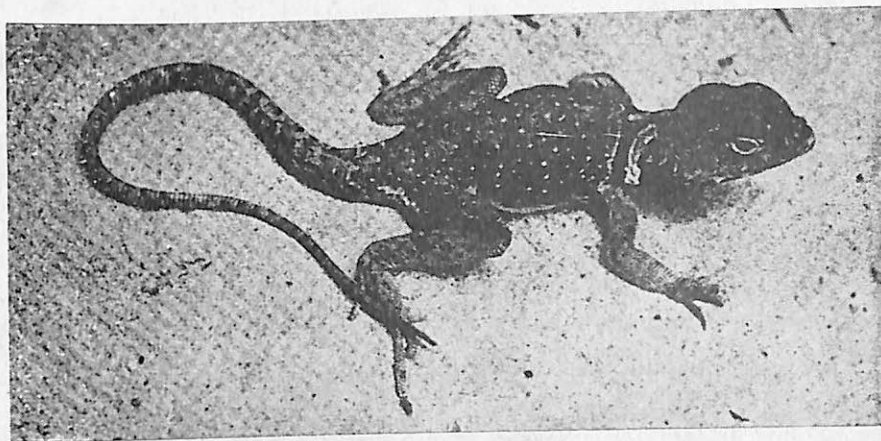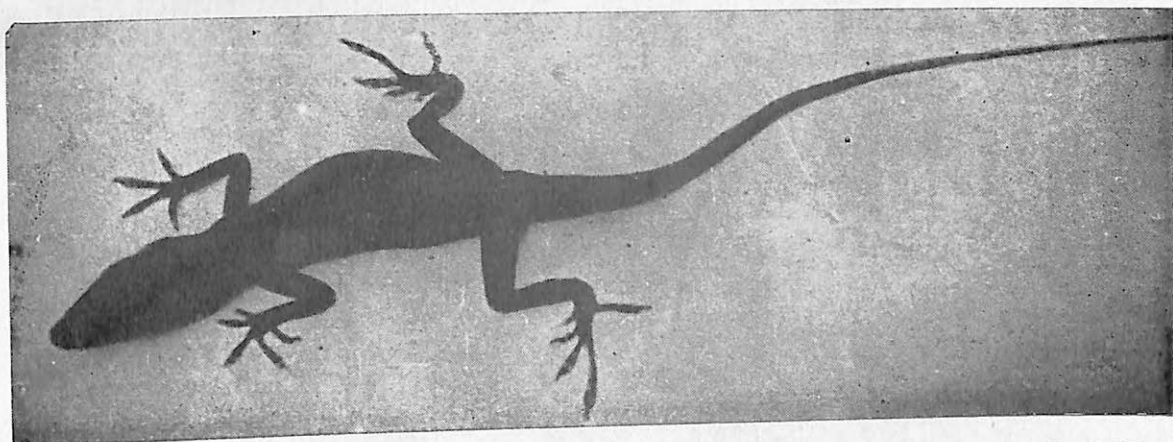
রেগিস্তানী বহুরূপী টিকটিকি

উড়ন্ত টিকটিকি
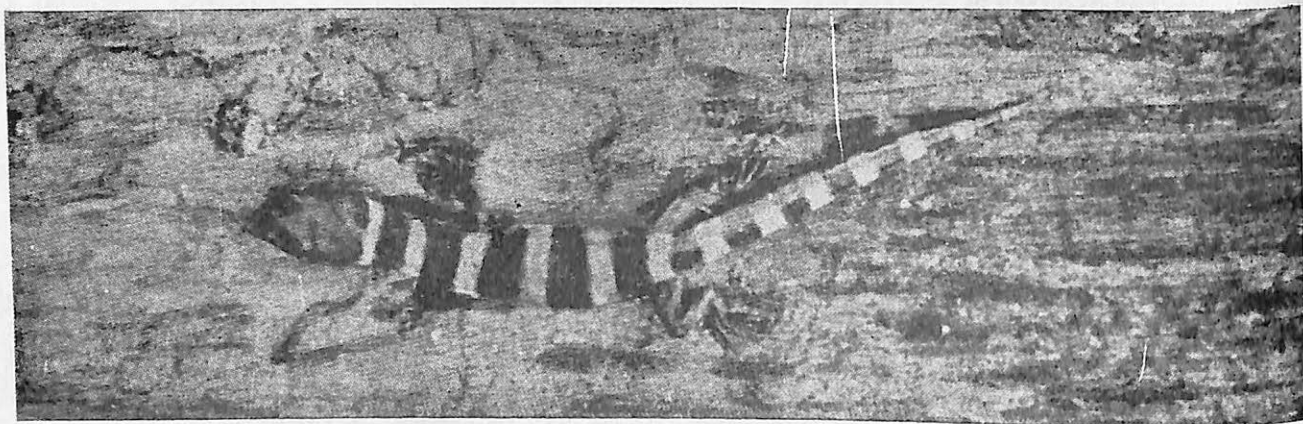
ডোরাকাটা মার্কিনী টিকটিকি
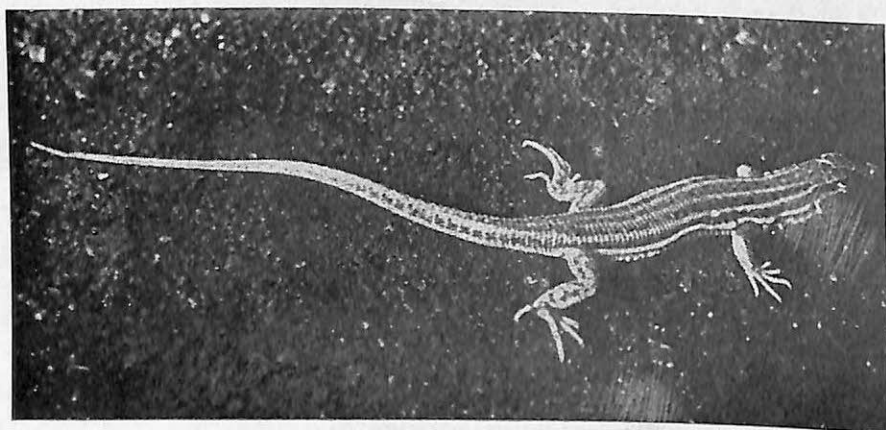
বালির টিকটিকি
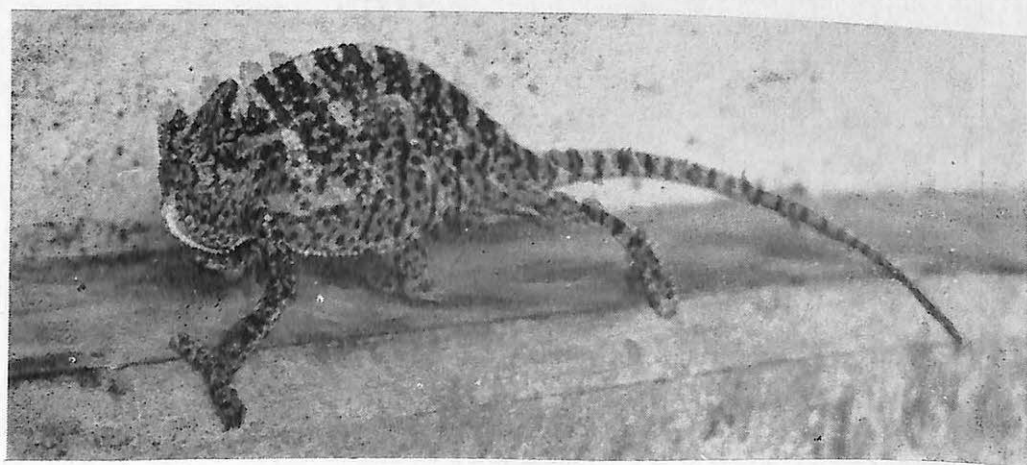
মার্কিনী বহুরূপী টিকটিকি
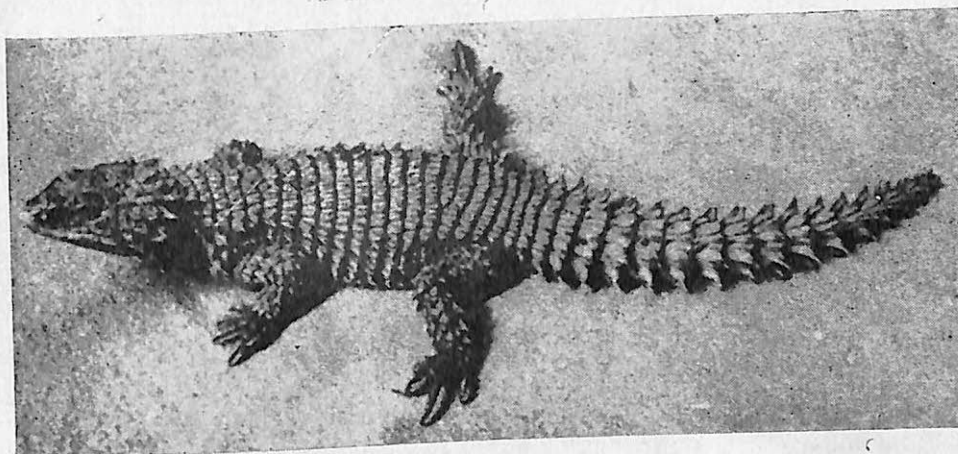
কাঁটাওয়ালা টিকটিকি

চ্যাপটামুখো টিকটিকি
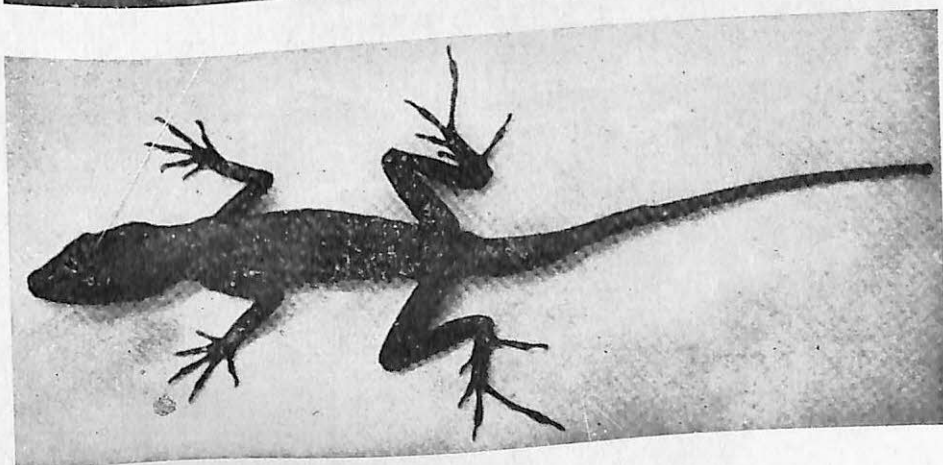
পশ্চিম ভারতের বহুরূপী টিকটিকি

রাক্ষস গোসাপ

ডোরাকাটা ঢিকাটাক
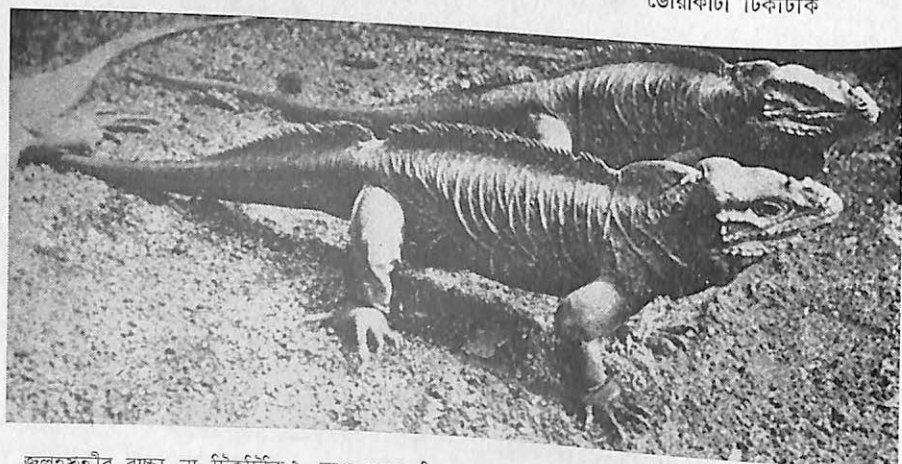
জলহস্তীর বাচ্চা না টিকটিকি? মুখ দেখে কি মনে হয়?

রেগিস্তানী বহুরূপী টিকটিকি
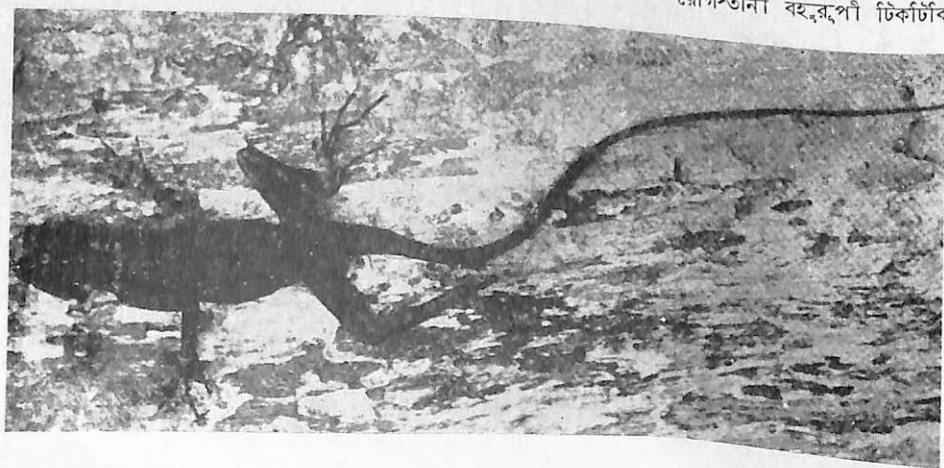
বাচ্চা গোসাপ
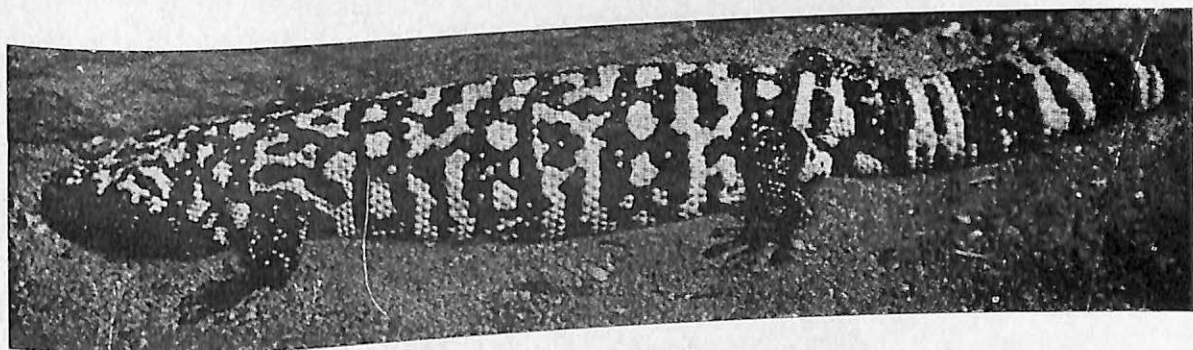
বিষধর টিকটিকি

মেক্সিকোবাসী টিকটিকির গায়ে কি মোতি চিহ্ন?
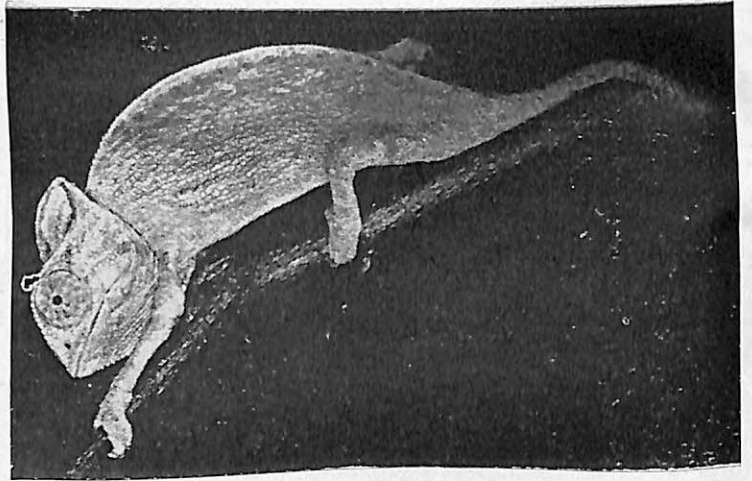
বহুরূপী টিকটিকি
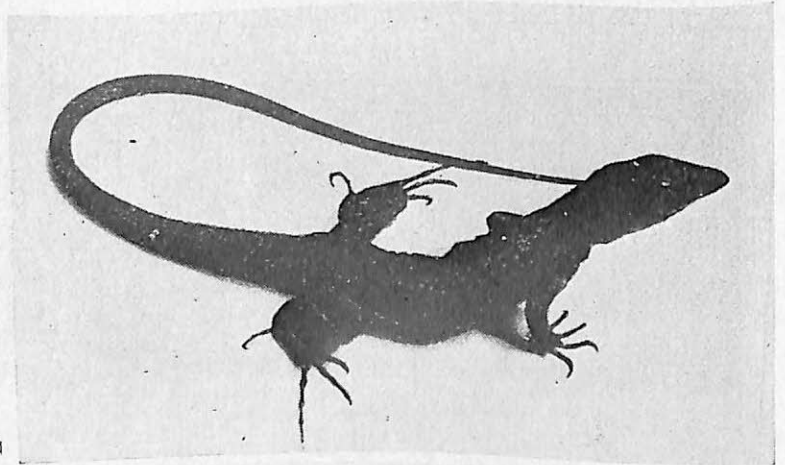
পুচ্ছই চাবুক এই টিকটিকির

গিরগিটি

বুনো টিকটিকি

বহুরূপী টিকটিকি
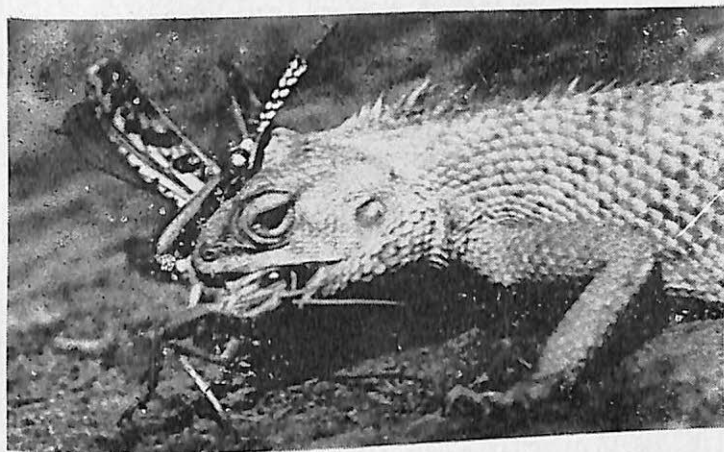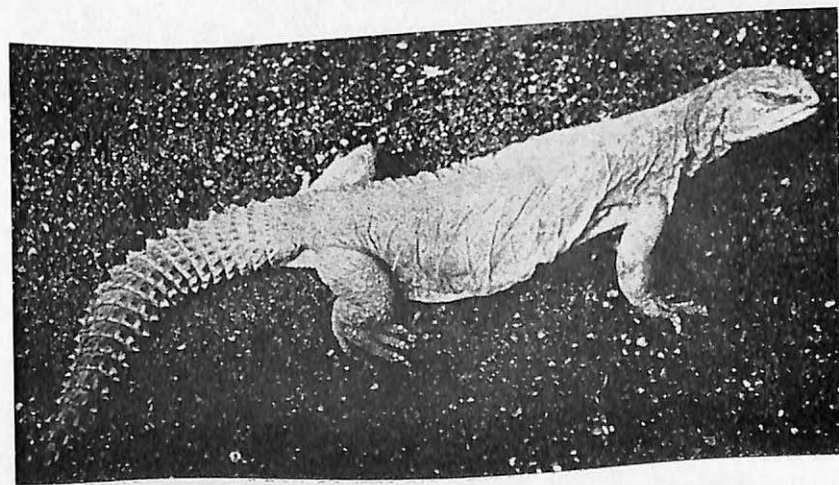
কাঁটাদার পুচ্ছযুক্ত টিকটিকি

মার্কিনী কুমীর ও ঘড়িয়াল
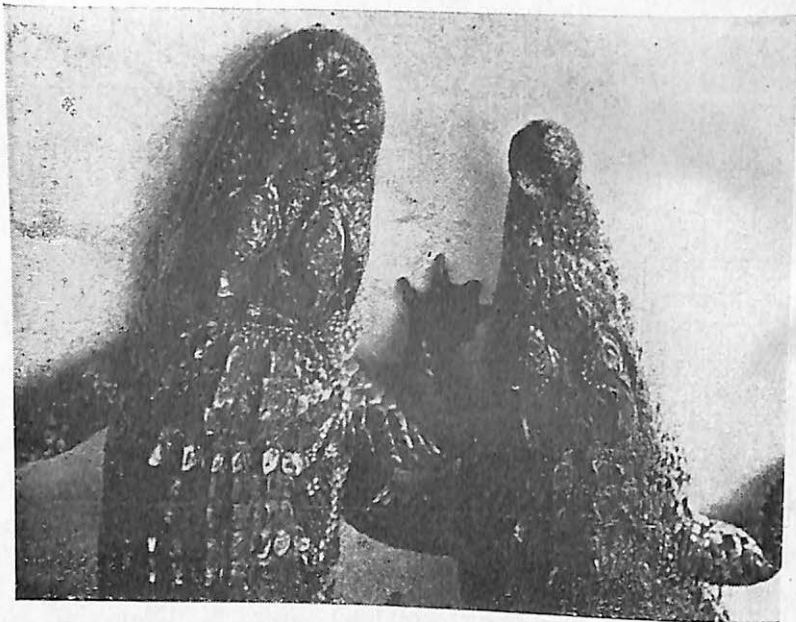
হাঁ-করা ভারতীয় কুমীর
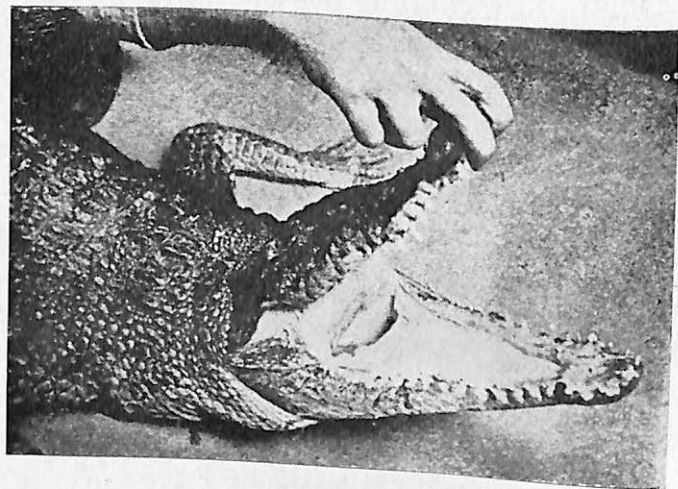
নোনাজলের একজোড়া কুমীর
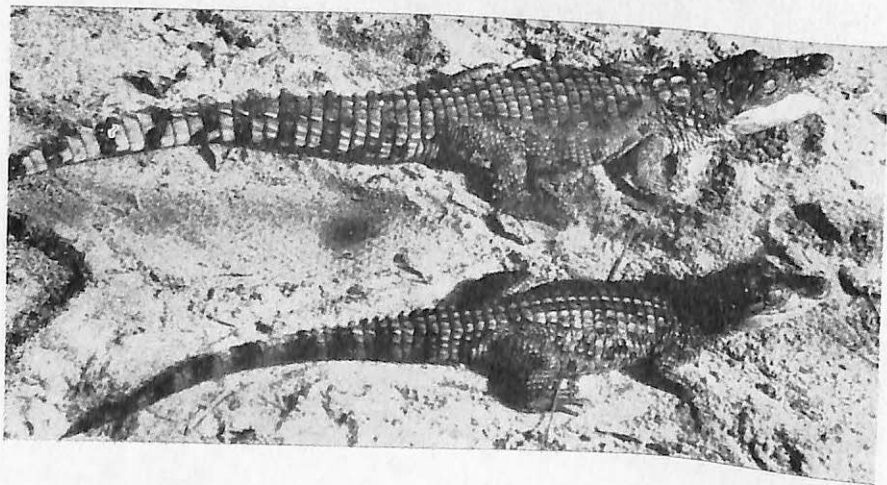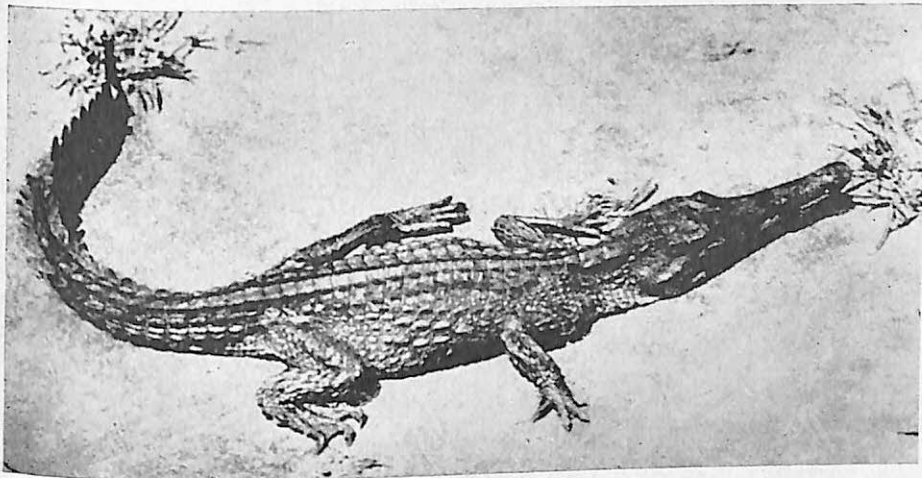
পশ্চিম আফ্রিকার কুমীর
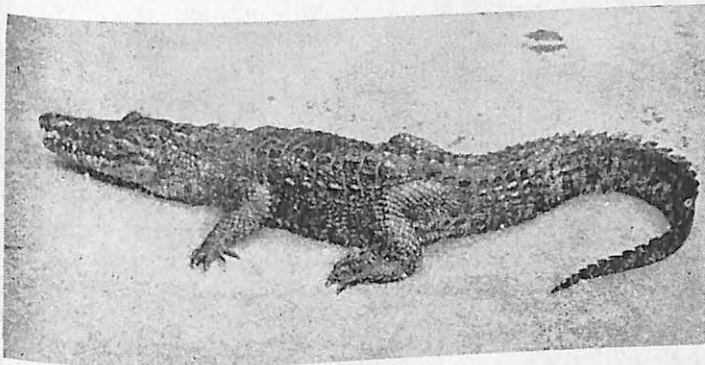
মিশরের কুমীর
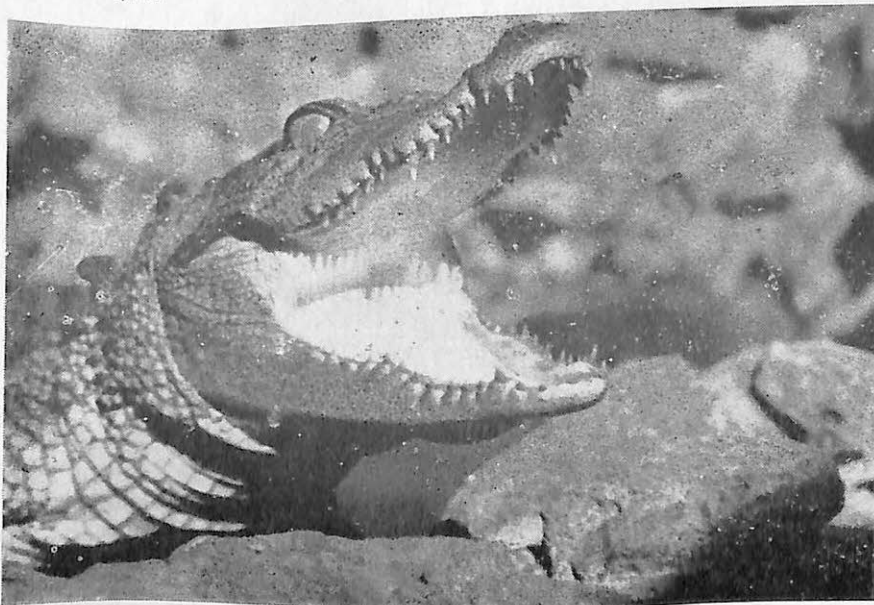
সর্বগ্রাসী হাঁ
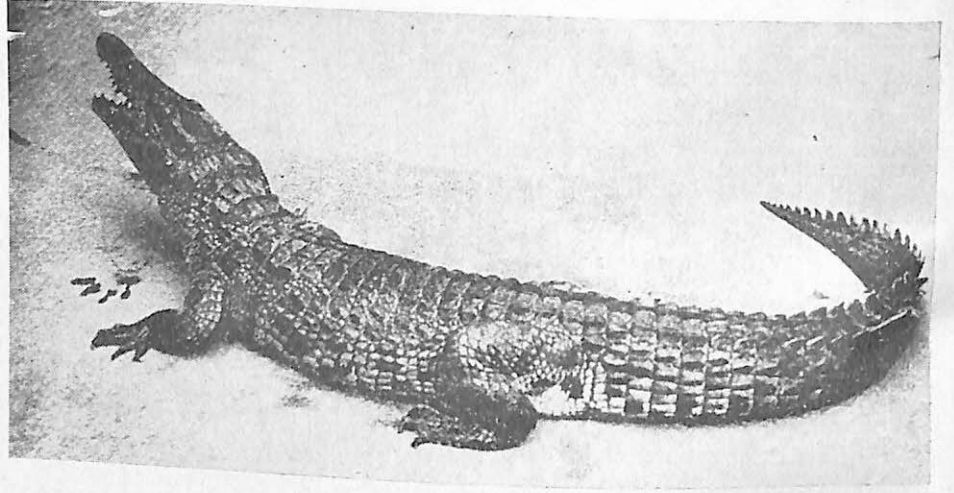
নীলনদের কুমীর
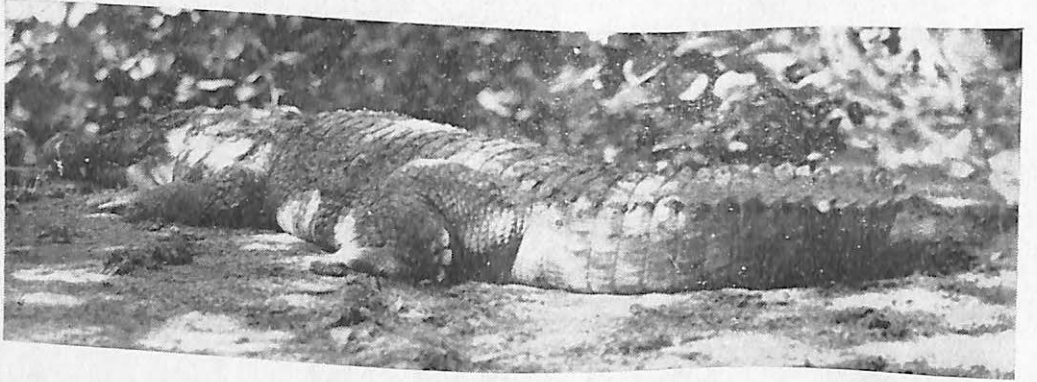
নোনাজলের কুমীর

ডিম ফেটে কুমীরের বাচ্চা বেরুচ্ছে
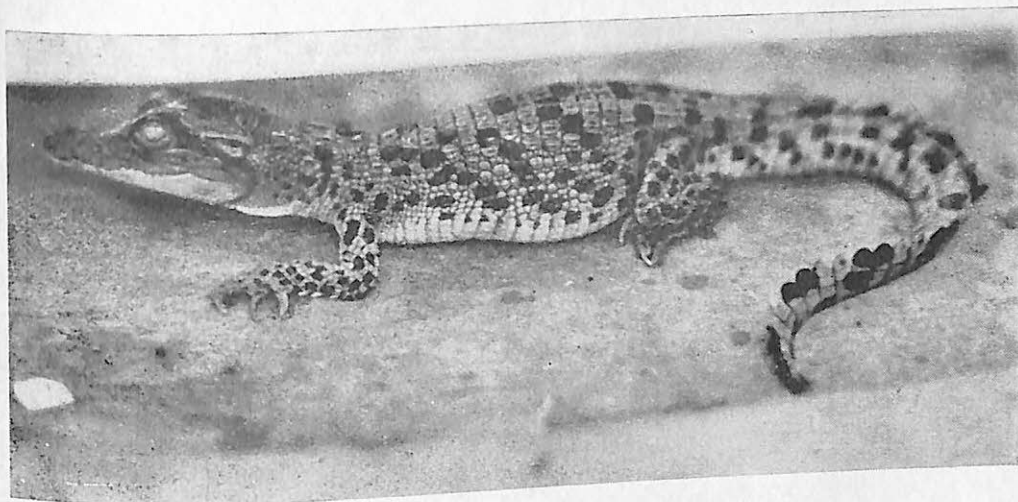
ভারতীয় কুমীর

মানুষের কোলে কুমীরের বাচ্চা
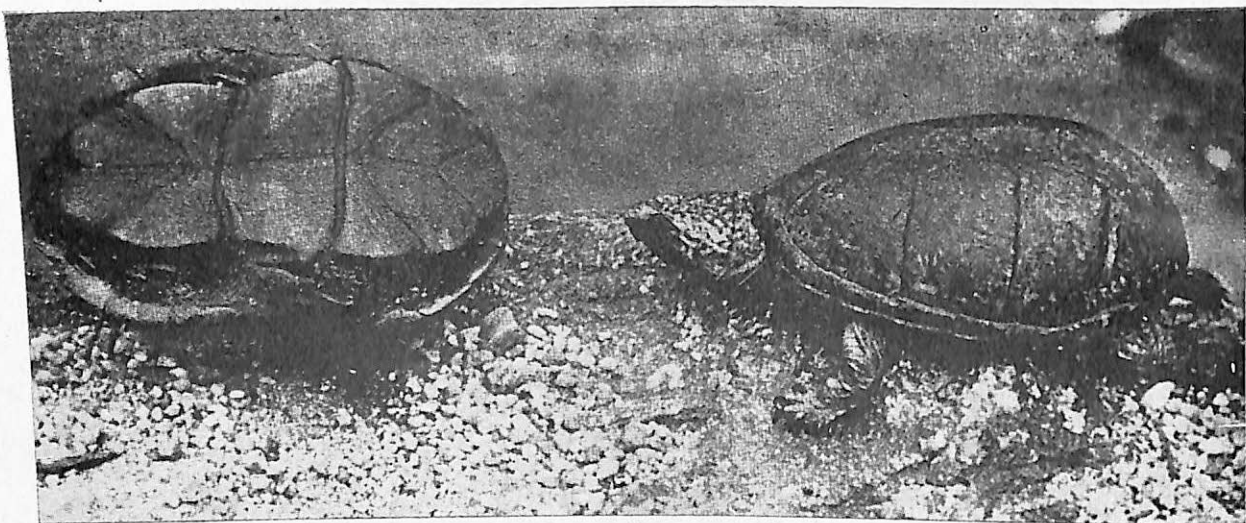
কাদার কচ্ছপ
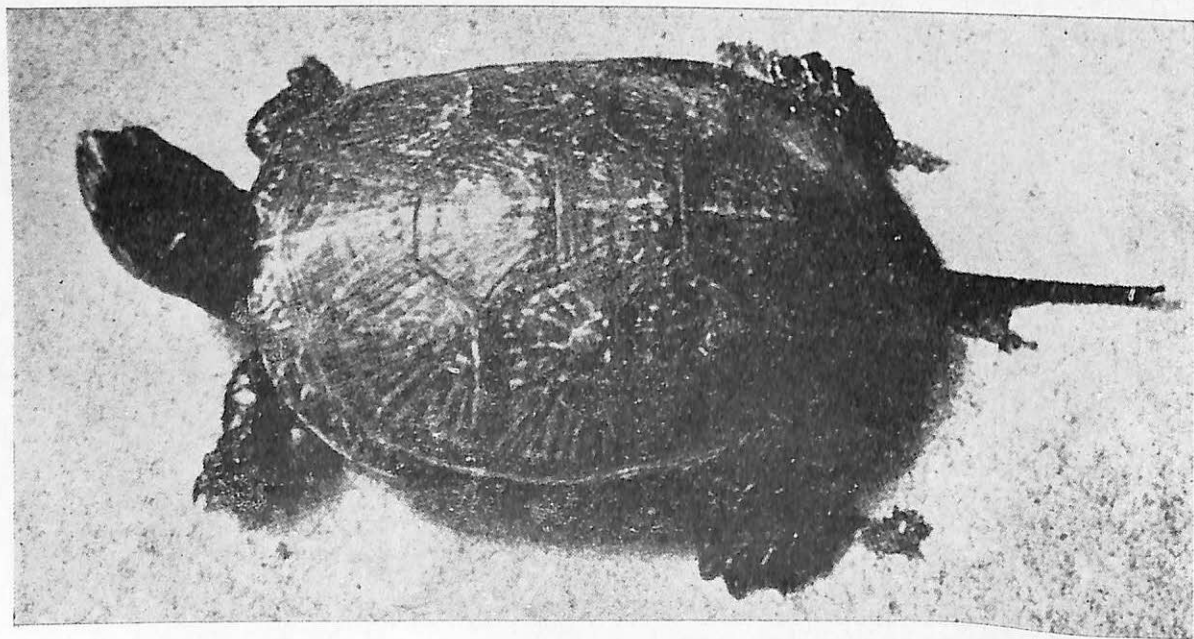
পুকুরের কচ্ছপ
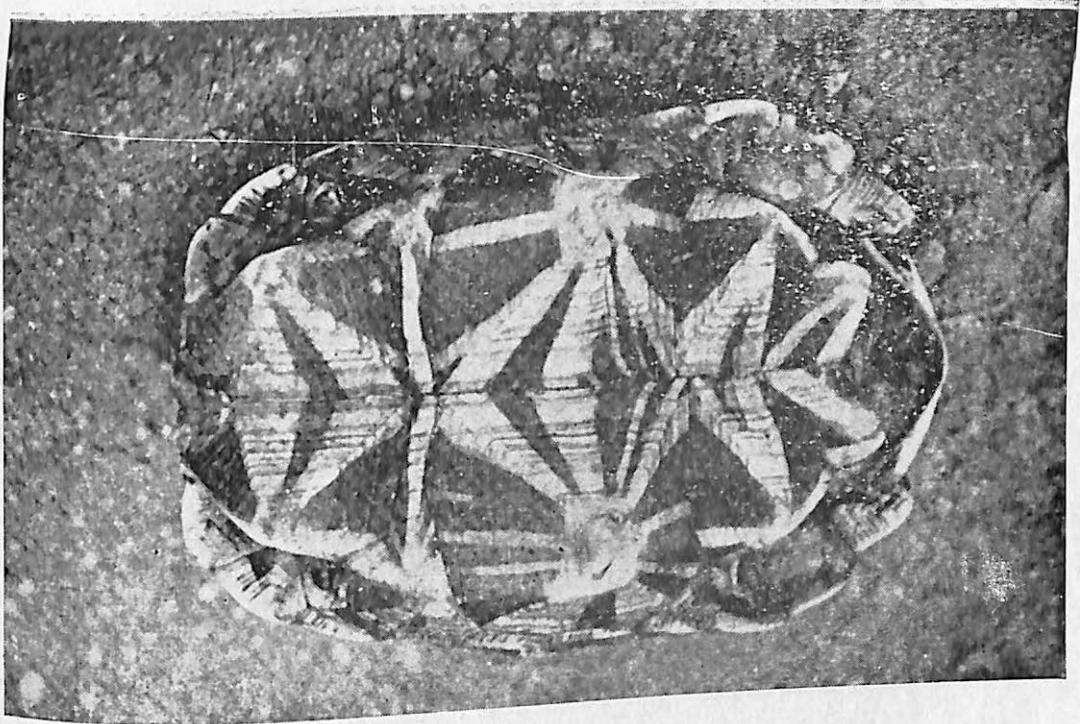
তারাসদৃশ কচ্ছপ
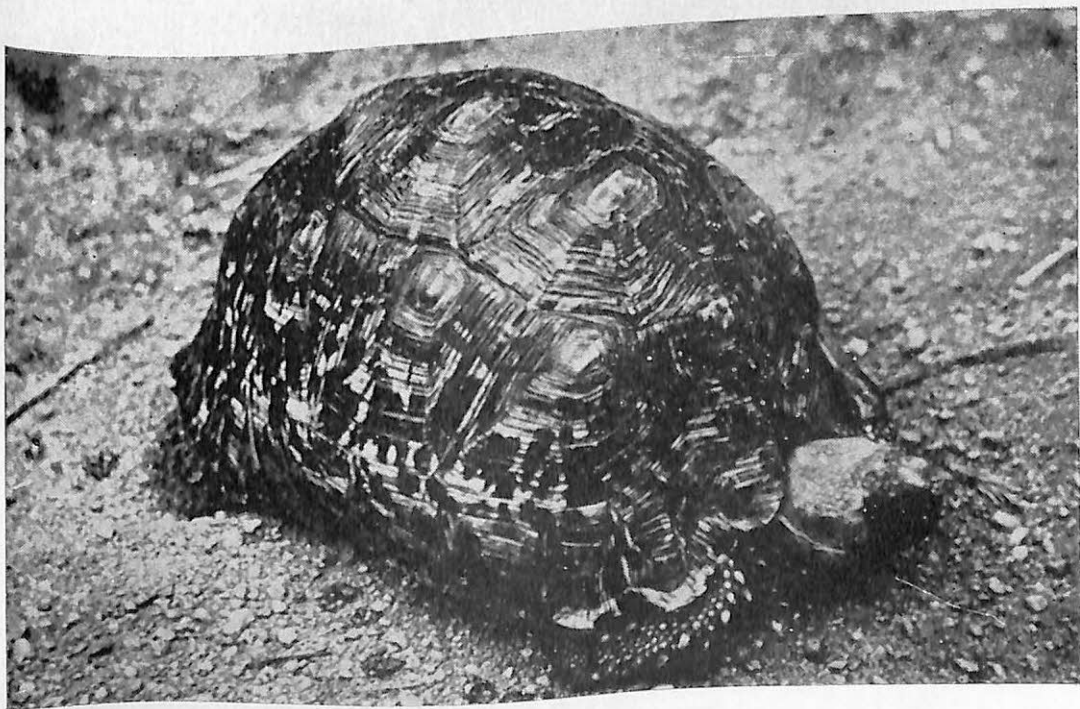
চিত্রবিচিত্র কচ্ছপ
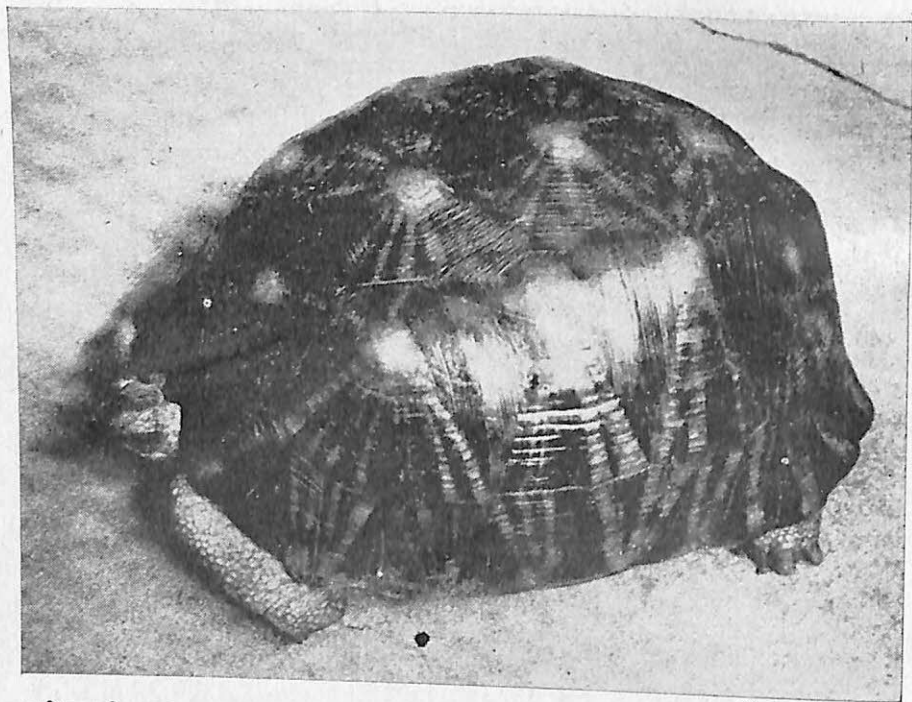
রেগিস্তানী কচ্ছপ
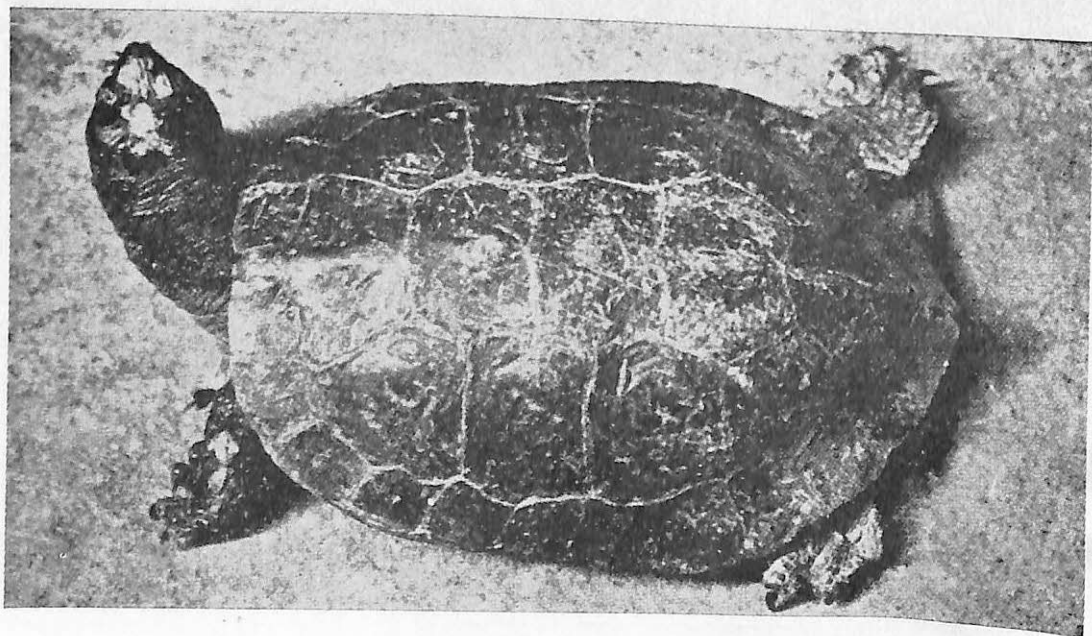
আলজিরিয় কচ্ছপ
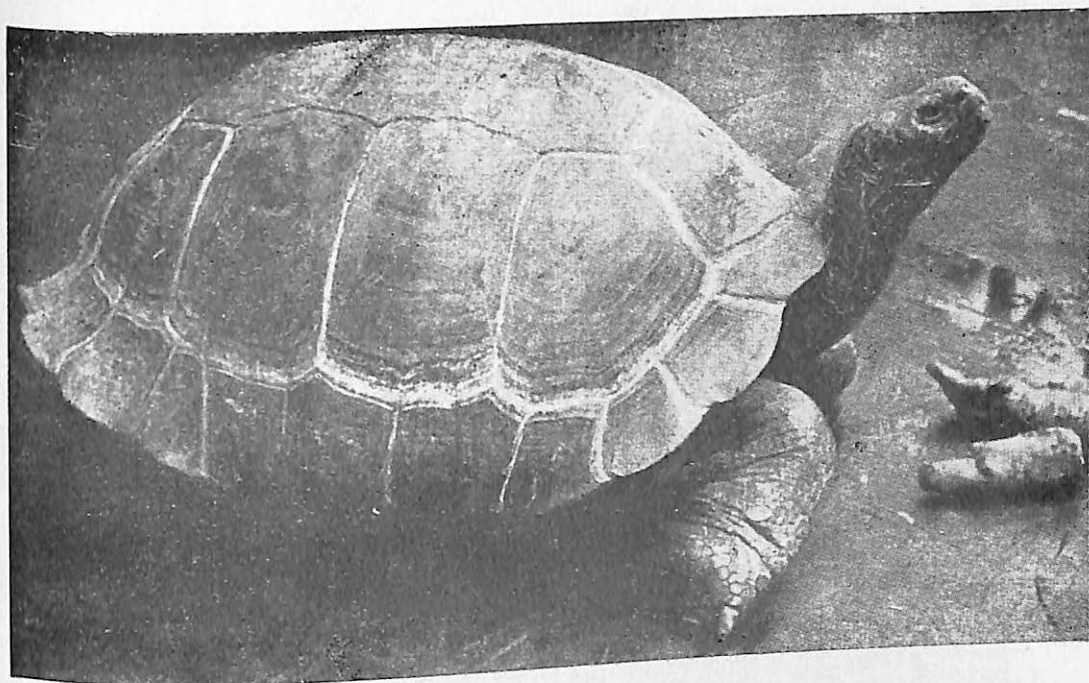
ভীমদর্শন কচ্ছপ

যুগল কচ্ছপ
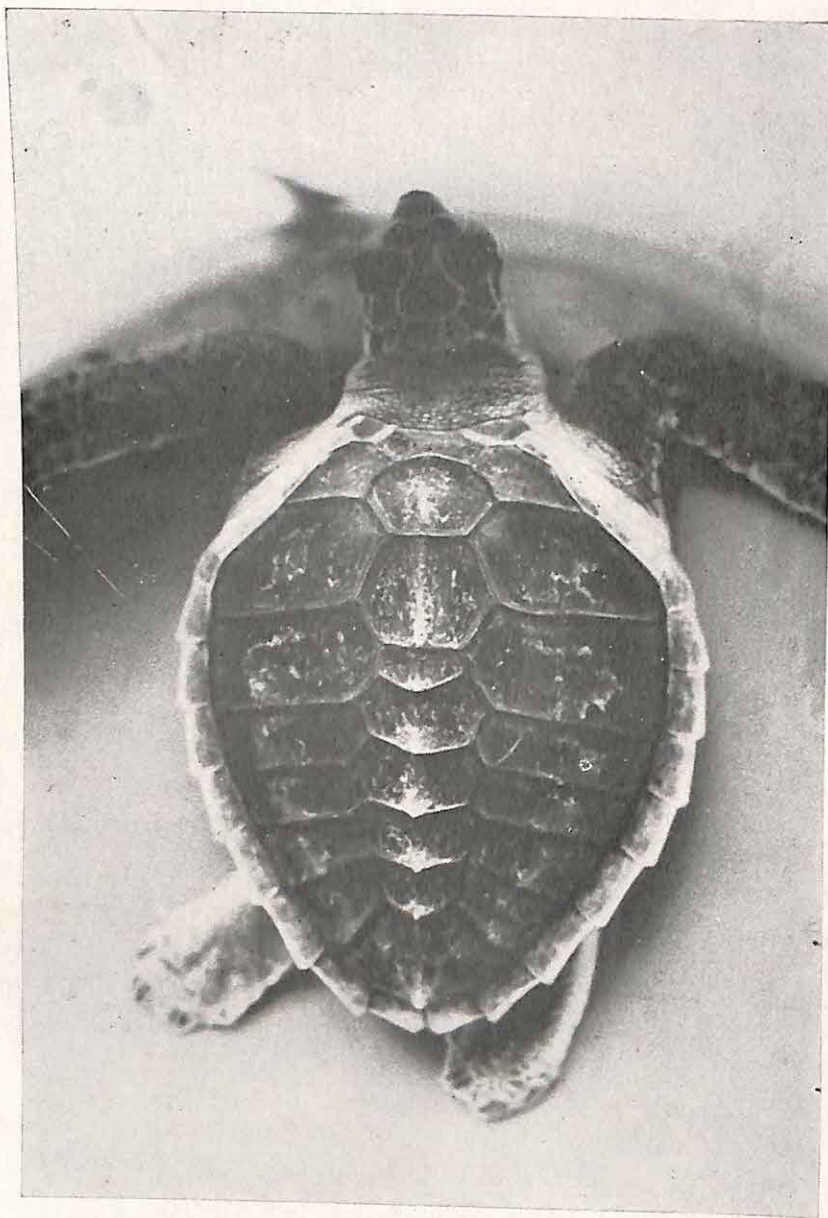
জলে সাঁতাররত কচ্ছপ

কোনো কোনো পাখীও সাপের শত্রু। সেক্রেটরী পাখী সাপকে কখনো জ্যান্ত ছেড়ে দেয় না। এই পাখী আফ্রিকাতে দেখা যায়।

অস্ট্রেলিয়ার কৌড়িয়ালা পাখী সাপের প্রচন্ড শত্রু। এদের এক বিচিত্র স্বভাব এই যে এরা কিছু সময় পরে পরেই হাসে। সেক্রেটরী পাখীর মত কৌড়িয়ালা পাখী মারাও সরকারী আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

সাপ সারসেরও প্রিয় খাদ্য। আমেরিকার বনে জঙ্গলে সারসেরা দল বেঁধে এক জায়গায় জমা হয় এবং মাছ ও জলচর সাপকে আক্রমণ করে। জলের তলার কাদার মধ্যে দিয়ে এরা পায়ের জোরে সবেগে হাঁটতে থাকে। ফলে সেখানে যে সব প্রাণী থাকে তারা জলের ওপরে ভেসে ওঠে। সারসের দল তৎক্ষণাৎ তাদের ধরে খেয়ে ফেলে। ওডিউবোনের মতে, দশ পনের মিনিটের মধ্যেই শত শত মাছ, ছোট কুমীর এবং জলচর সাপ জলের উপর ভেসে ওঠে। পাখীরা এদের মহানন্দে খেয়ে আবার পাড়ে চলে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে তারা জলে নামে এবং কাদায় নাড়াচাড়া দিয়ে খাদ্যবস্তু জোগাড় করে পেট ভরায়।

এখন বলছি সেই সব সাপের কথা যারা অন্য ছোট সাপ খেয়ে ফেলে। এদের মধ্যে প্রথম স্থান আমেরিকার কিং স্নেকের। উত্তর আমেরিকার এই সাপ বিষাক্ত ও বিষহীন দুরকমের সাপই গিলে খায়। এইভাবে এরা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর অনেক উপকার করে। র‍্যাটল সাপ, কপার হেড এবং মুকাসিন সাপই এদের পছন্দ। যদি কিং স্নেক এই সাপদের শুধু কামড়ে ছেড়ে দেয়—তাহলে এদের ওপর তার বিষের কোন প্রভাব পড়ে না। আশ্চর্যের কথা এই যে যদি অন্য কোনো দেশের বিষাক্ত সাপ এই কিং স্নেককে কামড়ায় তাহলে কিং স্নেক সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। সে কেবল আমেরিকার বিষাক্ত সাপের বিষের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

কোরাল সাপ এবং আফ্রিকার হলদে গোখরো দুইই সাপ-খেকো সরীসৃপ। প্রশ্ন এই যে, সাপ স্বজাতীয় সাপের বিষেই মরে, না অন্য কোনো জাতির সাপের বিষে? ভারতীয় সাপ সম্পর্কে স্যার জোসেফ ফায়র অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর মত হল, এক দেশের বিষাক্ত সাপ স্বজাতীয় বিষাক্ত সাপের বিষ থেকে কিংবা অন্য দেশের বিষাক্ত সাপ নিজের জাতির সাপের বিষ থেকে মুক্ত থাকে। নির্বিষ সব সাপই বিষাক্ত সাপের বিষে মারা যায়। কিন্তু ফিজ সাইমন সাহেবের মত অন্যরকম। তাঁর মতে, যদি আফ্রিকার হলদে গোখরো সাপের বিষ তার নিজের শরীরেই ঢোকে, তাহলে তার মৃত্যু হবেই। বাকল্যান্ড সাহেব পাফ্‌এডর সাপ সম্বন্ধে লিখেছেন—'আমাদের পশুশালার বাগানে একবার দুটি পাফ্‌এডরের সামনে একটি পাখী রাখা হয়। পাখীটাকে দেখামাত্র দুটি পাফ্‌-এডরই একসঙ্গে তার দিকে দৌড়ে গেল। পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল এবং একটা অপরটার মাথায় আঘাত করল। দুমিনিট পরে দেখা গেল আহত পফ্‌এডরটি মাটিতে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল। এই ফাঁকে অন্য পাফএডরটি দৌড়ে নিজের বাসায় চলে গেল। সাপেদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভদ্রলোক বলেন, সেই মৃতপ্রায় পাফ্‌এডর একটু পরে প্রাণে বাঁচল বটে কিন্তু তার শরীরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং তার মাথা এক দিকে কাৎ হয়ে থাকল। সে তার মাথাটা সোজা করতে পারত না এবং কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত।

পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র শ্রেণীর পিঁপড়ে আছে। এরা যখন সার বেঁধে কোথাও যেতে থাকে, তখন তাদের যাওয়ার পথে কোনো ছোট প্রাণী সামনে পড়লে তারা হয় তাকে সবাই মিলে তাড়িয়ে দেয় নয়ত মেরে খেয়ে ফেলে। কখনো কখনো তো এক মাইল লম্বা পিঁপড়ের সারি দেখতে পাওয়া যায়। যখন এরা শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলে তখন মনে হয় যেন কেউ বঁটি দিয়ে কোনো জিনিস কাটছে। লুই পি-ওয়াবলার লিখেছেন পিঁপড়ের দল একবার

একটা সাপকে মেরেই ফেলেছিল। একবার তিনি এক শিংওয়ালা ভাইপারের সঙ্গে একদল পিঁপড়ের যুদ্ধ দেখতে পেয়েছিলেন। পিঁপড়েরা সাপটির সারা শরীর ছেয়ে ফেলেছিল এবং সাপের সমস্ত শরীরটাকে কামড়াচ্ছিল। পনের মিনিট পর্যন্ত সাপটি পিঁপড়ের সারির মধ্যে চলাফেরা করতে পেরেছিল। তারপরে তার চলবার ক্ষমতা লোপ পেল এবং শেষে সে মরে গেল। আশ্চর্যের বিষয় মরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিঁপড়েরা তাঁর দেহের সব মাংস খেয়ে ফেলল। তার শরীরের কঙ্কালটাই শুধু পড়ে রইল। কোনো কোনো টিকটিকিও খুব সাপ খেতে ভালবাসে। অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপটা লেজওয়ালা টিকটিকি এবং কাচের মত স্বচ্ছ টিকটিকি উভয়েই সাপখেকো জীব।

টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ

প্রাচীনকালের সরীসৃপের অনেক বংশধর আজও জীবিত আছে। এদের মধ্যে কিছু স্থলে কিছু জলে এবং কিছু মাটির ভেতরে গর্তে থাকে। এদিক থেকে এদের তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। স্থলচর সরীসৃপদের মধ্যে টিকটিকি জাতীয় প্রাণীর স্থান সর্বপ্রথম। বৈজ্ঞানিকরা আজ পর্যন্ত এই জাতীয় সরীসৃপের প্রায় ১৯০০ বিভিন্ন প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন।

টিকটিকি জাতীয় প্রাণীরা বিভিন্ন আকারের হয়। কিছু কিছু টিকটিকি তো খুবই ছোট হয়, আবার কতকগুলি ৭ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। অধিকাংশ টিকটিকির শরীর পাতলা আঁশে ঢাকা থাকে। এই আঁশ খসখসে ও তীক্ষ্ণাগ্র হয়। কোনো কোনো টিকটিকির আঁশ মসৃণও হয়। আবার কোনো কোনো টিকটিকির গায়ে আঁশই থাকে না।

প্রায় সব টিকটিকিরই চার পা হয়। কিন্তু কোনো কোনো টিকটিকির কেবল দুটি পা। আবার এমনও কোনো কোনো টিকটিকি আছে যাদের পা-ই নেই। এদের থাবায় খুব ধারালো নখ হয়। কোনো কোনো টিকটিকির আঙুলের চার ধারে ছালের পংক্তির মত থাকে। এর সাহায্যেই এরা সহজেই বালুকাময় স্থানে চলাফেরা করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য মরুভূমির টিকটিকিদের মধ্যেই দেখা যায়।

টিকটিকির জিভ অনেক প্রকারের হয়। কোনো কোনো টিকটিকির জিভ মোটা ও চওড়া হয়। কিন্তু অধিকাংশেরই জিভ লম্বা, পাতলা এবং সাপের জিভের মত ডগার দিকে দুভাগ করা থাকে। কোনো কোনো টিকটিকির জিভের ডগায় এক রকমের আঠালো রস থাকে যা এদের শিকার ধরতে সাহায্য করে।

টিকটিকির লেজ সাধারণত ছোট এবং মোটা হয়, কিন্তু কারো কারো লেজ আবার লম্বা ও পাতলা হয়। কোনো কোনো জাতের টিকটিকির লেজ তো তাদের শরীরের ও মাথার দৈর্ঘ্যের দুইগুণ বা তিনগুণ লম্বা হয়। বড় আকারের টিকটিকিরা লেজ আছড়ে খুব জোরে শত্রুকে আঘাত করে। যে সব টিকটিকির লেজে কাঁটা থাকে, তারা শত্রুর শরীরে সেই কাঁটা ঢুকিয়ে মাংস কেটে বের করে নিয়ে আসে। আবার কিছু এমন টিকটিকিও আছে যারা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে শরীরের থেকে লেজটাকে আলাদা করে দেয়। লেজ কেটে গেলেও এরা কিছু-ক্ষণ নড়াচড়া করতে পারে। এই উঁচু হওয়া লেজকে শত্রু কামড়ে ধরে এবং এই ফাঁকে এরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কয়েক মাস পরে আবার নতুন লেজ গজায়। কিন্তু এই নতুন লেজ আগেকার লেজের চেয়ে ছোট হয় এবং তার উপরকার ত্বক খসখসে হয়।

টিকটিকি অত্যন্ত চটপটে হয়। কেউ কেউ তো এত দ্রুতবেগে দৌড়ায় যে তাদের প্রায় দেখাই যায় না। নিজের শরীরের সামনেটা উঁচু করে এবং পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে লেজের সাহায্যে এরা খুব জোরে দৌড়োয়। আশ্চর্যের কথা কোনো কোনো টিকটিকি উড়তেও পারে। এদের শরীরের ত্বক দুই দিকেই বাইরে বেরিয়ে থাকে এবং উড়ো-জাহাজের পাখার মত তা ছড়িয়ে পড়ে।

বড় বড় টিকটিকি কামড়ালে ঘা হয়, কিন্তু এই ক্ষতের দরুণ কারোর মৃত্যু হয়না। অনেকের ধারণা গোসাপ ও গিরগিটির কামড়ে মানুষ মরে যায়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র দুই জাতের টিকটিকির বিষ আছে বলে জানা গেছে। এদের মুখের ভেতর বিষগ্রন্থি থাকে এবং

শত্রুর শরীরে ঢোকানোর জন্যে বিষদাঁতও থাকে। এক বিষাক্ত জাতের টিকটিকি উত্তর আমেরিকার মধ্য মেক্সিকো থেকে আরম্ভ করে মধ্য আমেরিকা পর্যন্ত ভূভাগে দেখতে পাওয়া যায়। আর এক জাতের বিষাক্ত টিকটিকি নিউ মেক্সিকো ও এরিজোনায় দেখা যায়। এদের শরীরে গোলাপী ও কালো রঙের ডোরা থাকে।

এই দুই জাতের টিকটিকির মধ্যে প্রথম জাতের শরীর বেশী সুগঠিত এবং লেজ ছোট ও মোটা হয়। এদের শরীরে খুব চর্বি থাকে। এজন্য যখন তারা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেনা, তখন শরীরের এই চর্বি শুষে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে।

এই উভয় শ্রেণীর টিকটিকির বিষে ছোট ছোট জীবজন্তু মারা যায়। অনেক সময় মানুষও এদের কামড়ে প্রাণ হারায়। এরা বিষাক্ত হওয়া সত্ত্বেও লন্ডনের চিড়িয়াখানায় এদের রাখা হয়েছে। এদের রক্ষক নির্ভয়েই এদের নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এই সরল বিশ্বাসের কারণ বোধ হয় এই যে লন্ডনে মধ্য আমেরিকার মত গরম বা রোদ হয় না এবং এই দুয়ের অভাবে এই টিকটিকির শক্তি সম্ভবত কমে যায়। এরা প্রায় ৬০ সেঃমিঃ লম্বা হয় এবং এদের শরীরের ত্বক খসখসে হয়।

আর এক রকমের টিকটিকি ডিম দেয়। এই ডিমগুলো বেশ বড় আঁশওয়ালা এবং সাদা রঙের হয়। এক পশুশালায় প্রায় ৭ সেঃমিঃ লম্বা এবং ৪ সেঃ মিঃ ব্যাসের ডিম দেখতে পাওয়া গেছে। অথচ মজার কথা যে এই ডিম পেড়েছিল তার দৈর্ঘ্য প্রায় ½ মিটারের মত ছিল।

অধিকাংশ টিকটিকি স্থলে বিচরণ করে। কিন্তু কোনো কোনো জাতের টিকটিকি গাছের ওপরে, কেউ বা জলের মধ্যে এবং অল্প কিছু ভাগ জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই থাকে। সাধারণত এরা কোনো শব্দ করে না। কিন্তু এদের বিরক্ত করলে এরা খুব জোরে হিস হিস শব্দ করে। কখনো কখনো ঘরের দেয়ালে বিচরণকারী টিকটিকি টিক টিক শব্দ করে।

কোনো কোনো টিকটিকির গায়ের রঙ বদলাবার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদেই এই রঙ বদল। এই ক্ষমতার দরুণ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের আত্মগোপনের বেশ সুবিধা হয়। বিরক্ত করলে এই টিকটিকিরা অনেক রকমের রঙ বদল করে। এই রঙগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। এই টিকটিকি কেবলমাত্র উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডে কেবল এ ধরণের তিন জাতের টিকটিকি দেখা যায়। ঋতু পরিবর্তনের সময় গায়ের রঙ গাঢ় সবুজ হয়ে যায়। জুন মাসে স্ত্রী বহুরূপী এক ডজন পাতলা আঁশওয়ালা ডিম পাড়ে। মা-টিকটিকি বালির মধ্যে একটি গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে ডিমগুলো রেখে দেয় এবং গর্তটিকে ঘাসপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ডিমের ভেতর থেকে বাচ্চা বেরোয়। এই বাচ্চাগুলো ১ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। আর এক রকমের বালুকাবাসী স্ত্রী-টিকটিকি ইঁদুরের মত বড় বড় বাচ্চাও প্রসব করে।

কুইন্সল্যান্ড এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ঝালরওয়ালা টিকটিকি এক আশ্চর্য প্রাণী। এরা ৯০ সেঃ মিঃ লম্বা হয় এবং এদের ঘাড়ের চারদিকে ঝালর থাকে। রেগে গেলে এরা এই ঝালর ফুলিয়ে দেয়। সাধারণত এই ঝালর এদের শরীরের দুই দিকে চওড়া হয়ে ঝুলে থাকে। এই ঝালর হলদে রঙের হয় এবং তার উপর লাল রঙের দাগ থাকে। হঠাৎ এই ঝালর ফুলিয়ে এরা শত্রুর সামনে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। এই জাতির টিকটিকির আকৃতি অত্যন্ত ভীষণ হয়। এরা ক্ষতিকারক প্রাণী। দৌড়বার সময় এরা এদের মাথা ও লেজ ওপরের দিকে তুলে নেয়।

মোটা লেজওয়ালা এক রকমের টিকটিকি আছে যা দেখবার মত। আরবদেশবাসীরা এদের বলে হাদিম বা কার্দুম। শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এরা খুব দ্রুত দৌড়ে পালায়, আবার কিছু দূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখে। এই অবস্থায় এরা মাথা উঁচুনীচু

করতে থাকে এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবার দৌড়ে পালাতে থাকে।

পশ্চিম এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় এক অদ্ভুত টিকটিকি দেখা যায়। এদের বলে মোলোচ। এদের মাথা, শরীর, হাত-পা, লেজ সর্বাঙ্গ কাঁটায় ভরা থাকে। মাথার পেছনদিকের কাঁটা ১ সেঃ মিটারের মত উঁচু হয়। এই জাতের টিকটিকিরা ১২ সেঃ মিটারের মত লম্বা হয়। এরা দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও অনিষ্টকর নয়। এরা কখনও শত্রুর শরীরে নিজেদের কাঁটা ঢোকায় না। যদিও আত্মরক্ষার জন্যই প্রকৃতি তাদের এই অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। এরা ছোট ছোট পিঁপড়ে খায়। একবার হাজারেরও বেশি পিঁপড়ে খেয়ে ফেলে।

শিংওয়ালা টিকটিকি আর এক বিচিত্র প্রাণী। এদের শরীর চ্যাপ্টা ও চওড়া। লম্বায় এরা ১২ সেঃ মিঃ। আমেরিকা এবং মেক্সিকোতে এদের ১৫ রকমের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের শরীর ও মাথা ছুঁচলো কাঁটায় সাজানো থাকে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, কোন প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হলে এরা এদের চোখের কোণ থেকে কয়েক ফুট দূর পর্যন্ত রক্তধারা ছুঁড়তে থাকে। যদি কেউ এদের উল্টে দেয় তাহলে এরা ক্রুদ্ধ হয়ে চোখের কোণ থেকে রক্তবর্ষণ করতে থাকে এবং অবশেষে শান্ত হয়ে পড়ে যায়। তখন মনে হয় এরা বুঝি মরেই গেছে।

মধ্য আমেরিকার উষ্ণ প্রদেশে এমন এক রকমের টিকটিকি দেখা যায় যাদের মাথা, পিঠ ও লেজের চামড়া উপরের দিকে ওঠানো থাকে। মাথার চামড়া শুধু পুরুষ টিকটিকিরই ওঠানো থাকে। প্রাচীন-কালের লেখকরা এদের সম্বন্ধে অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। এক লেখক লিখেছেন—সিরিনিকা প্রদেশে, একটি সাপ থাকত। সে বারো আঙুলের চেয়ে বেশী লম্বা ছিল না। তার শরীরের ওপর এক সাদা চিহ্ন ছিল। তার হিস হিস শব্দে অন্য সাপেরা ভয় পেয়ে যেত। সে অন্য সাপের মত কুন্ডলী পাকাত না। নিজের বিষে ঝোপঝাড় এবং চারাগাছগুলোকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিত। শরীরের সামনের দিকটা উঁচু করে উঠিয়ে চলাফেরা করত। পাথরও টুকরো টুকরো করে ফেলত এই সাপ। লোকের ধারণা তার ২½ মিঃ উঁচু দুটি বড় বড় পাখনা ছিল এবং তার মাথায় রাজমুকুটের শোভা দেখা যেত।

আর এক লেখক বলেছেন, ঐ সাপের বিষ প্রাণ-ঘাতী ছিল। তার নিঃশ্বাসে বড় বড় বিষাক্ত সাপও প্রাণ হারাত। এইরকম আর একটি কাল্পনিক কাহিনী আছে। একবার একটি লোক ঘোড়ায় চড়ে বল্লমের আঘাতে এই সাপকে মারতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষের প্রভাবে ঘোড়াসমেত লোকটি প্রাণত্যাগ করে।

এ সমস্ত কাহিনীই কাল্পনিক। আসলে প্রাচীন যুগের লোকেরা এই সব প্রাণী সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। এজন্য তাদের এই সমস্ত কাহিনীই স্বকপোলকল্পিত।

গেছো টিকটিকিরা গাছের ওপরেই থাকে এবং খুব দ্রুতবেগে গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। জলের উপর ঝুলে পড়া গাছের ডালে এরা খুব আনন্দে থাকে এবং নির্ভয়ে জলের মধ্যে ডুব লাগায়। সাঁতার কাটবার সময় এদের ঘাড় ও লেজ জলের উপরে থাকে।

ঘরের দেয়ালে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকির প্রায় তিনশ প্রজাতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বাস করে। এদের অধিকাংশই আকারে ছোট ছোট। সর্ববৃহৎ টিকটিকি ৪০ সেঃ মিটারের মত। বাকীরা ৮/১০ সেঃ মিটারের বেশী লম্বা হয় না।

প্রায় সমস্ত টিকটিকিরই চোখে স্বচ্ছ পাতলা নরম চামড়া থাকে। এদের চোখের পাতা থাকে না। সব টিকটিকিরই আঙুলে এমন ব্যবস্থা করা আছে যাতে এরা সহজেই দেয়ালের সঙ্গে আটকে থাকতে

পারে এবং ছাতে উল্টো হয়ে চলাফেরা করতে পারে। এই টিকটিকিরা নিরীহ গোছের। কিন্তু লোকে এদের নানা ক্ষমতার কথা বলে থাকে। টিকটিকি নিজের হাতপায়ের পাতা থেকে বিষ বের করে—এরকম একটা কথা বলা হয়ে থাকে। এবং যে ব্যক্তির শরীরের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায় তার শরীরে ঐ হাতপায়ের পাতা থেকে ঢালা বিষ থেকে ক্ষত হয়। উত্তর আফ্রিকা, আরব ও সিরিয়া দেশে এক রকমের টিকটিকি দেখা যায় যাকে সেসব দেশের অধিবাসীরা কুষ্ঠরোগের জনক বলে বিশ্বাস করে। এই টিকটিকি সম্বন্ধে এও বলা হয় যে তাদের দাঁত এত তীক্ষ্ম যে তারা তা দিয়ে লোহার পাতও ফুটো করতে পারে।

প্রায় সব টিকটিকিই দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং রাতে শিকারে বেরোয়। আবার কোনো কোনো টিকটিকি দিনের বেলায় ঘোরাফেরা করে এবং রাতে ঘুমিয়ে থাকে। অনেক টিকটিকি গাছের ডালে থাকে। কেউ কেউ ঘরে, আবার অনেকে বালির মধ্যে গর্ত বানিয়ে তাতে থাকে। গর্তবাসী টিকটিকিদের শোষক নল থাকে না এবং গঠনে তারা গৃহবাসী টিকটিকির চেয়ে দুর্বল হয়। কোনো কোনো জাতের টিকটিকির আঙুলে কোঁচকানো নখ থাকে। এদের শরীর ছোট ছোট পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং এদের লেজ সহজেই ছিঁড়ে যায়।

এধরণের সবচেয়ে বড় টিকটিকি ভারতের পশ্চিম-বঙ্গ, দক্ষিণ চীন এবং মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপগুলিতেই বেশীর ভাগ দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানের অধিবাসীরা এদের 'তোকায়ে' নামে ডাকে। কারণ এরা চীৎকার করার সময় 'তোকায়ে' শব্দটি উচ্চারণ করে এবং বহুক্ষণ ধরে চীৎকার করে। এরা শুধু কীটপতঙ্গই খায় না, চামচিকে, ইঁদুর, ছোট ছোট পাখী এবং ছোট ছোট টিকটিকিদেরও খেতে ভালবাসে।

এক ছোট জাতের মোটামুখো টিকটিকির কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এই জাতের টিকটিকি দক্ষিণ ইয়োরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় দেখা যায়। এদের আঙুলে শোষক নল থাকেনা এবং এদের ছোট লেজ অত্যন্ত মোটা হয়। তার মধ্যে এক পুষ্টিকর পদার্থ জমা থাকে। অস্ট্রেলীয় জাতের টিকটিকি ছাপওয়ালা বাদামী রঙের হয়। এদের চলাফেরার রীতি অত্যন্ত বিচিত্র। এরা অন্যান্য টিকটিকির মত পেটের জোরে হাঁটে না। বরং পায়ের ওপর ভর করে শরীরটাকে উঁচু করে অর্ধ-গোলাকার বানিয়ে ধীরে ধীরে এগোয়। এই ধরণের চলন রীতি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো জীবের দেখা যায়নি।

অস্ট্রেলিয়া আশ্চর্যজনক জীবজন্তুর আবাসস্থল। সেখানে এক অতি ক্ষুদ্র লেজওলা টিকটিকি দেখা যায়। এদের লেজ খুবই ছোট, চওড়া এবং এদের মাথার সমান মনে হয়। মাথা এবং লেজে এমনই সাদৃশ্য যে অনেকে এদের দুই মাথাওয়ালা বলে বর্ণনা করেছেন। দূর থেকে দেখে সহজে কেউ বলতে পারবেনা যে এদের মাথা কোনদিকে।

এই টিকটিকিরা ক্ষিপ্রগতি হয়না। কোনো প্রাণী কাছে এলে এরা সরেও যায়না, এজন্য ওখানকার বাসিন্দারা এদের সহজেই ধরতে পারে। এরা নিদ্রালু টিকটিকি নামে প্রসিদ্ধ। শীতকালে এরা দীর্ঘ নিদ্রার সময় লেজের মধ্যে ভরা খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে তরল করে খেতে থাকে। চর্বির আকারে ভোজ্যবস্তু এদের লেজের মধ্যে মজুত থাকে। অন্যান্য জন্তুর মধ্যে সাপ, টিকটিকি, কেঁচো এবং ফল খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের বাচ্চা মায়ের তুলনায় অর্ধেক লম্বা হয়। আর কোনো টিকটিকি এত বড় বাচ্চা দেয়না।

দক্ষিণ ইয়োরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার বাদামী রঙের টিকটিকি দেখলে তাদের পা আছে কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এদের ছোট ছোট চারটি পা আছে। প্রত্যেক পায়ে তিন তিনটি আঙুল থাকে। কিন্তু এই আঙুলগুলোর সাহায্যে এরা চলাফেরা করতে পারে না। এরা সাপের মত বুকে হেঁটে চলে। এজন্য অনেকে এদের সাপ বলেই ভুল করে।

এরা প্রায় ৩৩ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। কিন্তু এদর লেজের দৈর্ঘ্য পুরো শরীরের অর্ধেক। এরা প্রায় সর্বদাই ভিজে মাটিতে থাকতে ভালবাসে এবং কেঁচো, শামুক, কীটপতঙ্গ এবং ছোট জীবজন্তু ধরে খায়। এরা ক্ষতি করে না। তবুও লোকের বিশ্বাস এরা বিষাক্ত। এদের কামড়ে নাকি গরু পর্যন্ত মরে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এদের মুখের মধ্যে কোন বিষগ্রন্থি পাওয়া যায়নি।

সব টিকটিকিই কিন্তু ছোট হয় না। কোনো কোন টিকটিকি তো এত বিরাট হয় যে না দেখে তাদের বিশালতা সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। আফ্রিকা, ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়াতে অতি বিশাল টিকটিকি দেখতে পাওয়া যায়। এদের গিরগিটি, বিষখপরা (তক্ষক), এবং গোসাপ বলা হয়ে থাকে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের গোসাপ সব চেয়ে বড় হয় এবং প্রায় ৭মিঃ লম্বা হয়।

গিরগিটি

গিরগিটি খুবই সাধারণ প্রাণী। প্রায় সকলেই এর আকৃতির সঙ্গে পরিচিত। এর বৈশিষ্ট্য এই যে এদের মাথার ওপর ঝুঁটি হয়েছে। এরা রং বদলাতে পারে, তবে ভয় পেয়েই এরা রং বদলায়। দুপুরের চেয়ে সন্ধ্যার সময়েই এদের রং গাঢ়তর হয়। পুরুষ গিরগিটি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হয়। লড়াই করবার সময়েই এরা রঙ বদলায়। স্ত্রী-গিরগিটি যখন পাশেই ঘাসপাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তখন পুরুষ গিরগিটি প্রেম নিবেদন শুরু করে এবং স্ত্রী-গিরগিটির সামনে অনেক রকমের খেলা দেখাতে থাকে। সে কোন ঢিবি বা কলাপাতার ওপর বসে এই সব খেলা দেখায় এবং ধীরে ধীরে স্ত্রী-গিরগিটির কাছাকাছি আসতে থাকে। এই সময়ে এর গায়ের রঙ হাল্কা লাল-হলুদ হয়ে যায়। পুরুষ গিরগিটি তার শরীরের সামনের দিকটা উঁচু করে মাথাটা উপর-নীচে দোলাতে থাকে। এই সময় এদের মুখ ক্রমাগত খুলতে এবং বন্ধ হতে থাকে। কিন্তু এরা কোন শব্দ করে না। যদি কোন ব্যক্তি বা কোন প্রাণী এই সময়ে এদের ধরে নিয়ে যায় তাহলে অন্য আর একটি পুরুষ-গিরগিটি কয়েক ঘন্টা পরে সেখানেই এই রকম অভিনয় করতে থাকে। গিরগিটিরা ৩৫ সেঃ মিঃ লম্বা হয় এবং এদের লেজ শরীরের প্রায় চারগুণ বড় হয়। এদের পুরো শরীর এবং লেজ লোমে ঢাকা থাকে। যখন এরা ক্রুদ্ধ হয় কিংবা খাবার খেতে থাকে তখন এদের মাথা ও গলা গাঢ় লাল রঙে পরিণত হয়ে যায়। এছাড়া এদের শরীরের হাল্কা বাদামী রঙ হাল্কা হলুদবর্ণ হয়ে যায়।

গিরগিটিদের রঙ পরিবর্তন সম্বন্ধে একজন লেখক জানিয়েছেন, এক সময় এক গিরগিটি একটা গাছের ডাল থেকে নীচে নামছিল। তখন তার গায়ের রঙ ছিল হাল্কা নীল। সে তাড়াতাড়ি গাছের গুঁড়ি বেয়ে নেমে হঠাৎ গুঁড়ির নীচে এসে থেমে গেল। এক-দু মিনিট অপেক্ষা করে সে একটা ফড়িংকে ভীষণ জোরে কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত তার নীল রঙ বদলে গেল এবং সে মাটির রঙের মত বাদামী হয়ে গেল। এরপর সে ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার অন্য একটা গাছে চড়ে বসল এবং আবার তার শরীরের রঙ হাল্কা নীলে পরিণত হয়ে গেল।

বিষখপুরা

আরব দেশের লোকেরা বিষখপুরাকে বলে ওরান। এরা ডাঙ্গাতেই বসবাস করে বটে, কিন্তু এই জাতের কোনো কোনো প্রাণী জল ও স্থল দু-জায়গাতেই থাকে। বালুকাময় স্থান এবং ঘন অরণ্যেও কিছু কিছু বিষখপরা বসবাস করে। এরা সর্বভুক প্রাণী অর্থাৎ যে জীবকে এরা মারতে পারে তাকেই খেয়ে ফেলে। বিষখপরা ২ মিটারের মত লম্বা হয়। সাধারণ লোকের ধারণা এরা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং কামড়ালে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এদের শরীরের কোনো অংশেই বিষের সন্ধান পান নি। কয়েকটি প্রাণীকে বিষ-খপরার কামড় খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে

তাদের কোনোটিই মারা যায়নি। অতএব একথা বলা যায় যে বিষখপরার শরীরে বা মুখে বিষ থাকে না।

গোসাপ

গোসাপ সম্বন্ধেও অনেক কাল্পনিক ও ভ্রান্ত কাহিনী প্রচলিত আছে। এরা বেশ লম্বা হয়। প্রায় ৭ মিঃ লম্বা গোসাপও দেখতে পায়া যায়। সাধারণত এরা ২ থেকে ৫ মিঃ লম্বা হয়। এদের শরীরে কাঁটা থাকে না। এদের ত্বক খসখসে হয়। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়াতে গোসাপ দেখতে পাওয়া যায়। এরা বাড়ীতে জলের মধ্যে এবং গাছের ডালে বসবাস করে। জলে সাঁতার কাটবার সময় এদের পা শরীরের সঙ্গে এঁটে যায় এবং লেজ হালের কাজ করে। এদের খাদ্য তালিকা বিচিত্র। শ্যামদেশে এরা মৃতদেহের মাংস খায়। কখনো কখনো এমনকি নিজেদের মৃত আত্মীয়স্বজনের মাংসও খেয়ে থাকে। কোনো কোনো গোসাপ কাঠবিড়ালী ধরে খায় এবং ছোট ছোট কচ্ছপ গিলে খেয়ে ফেলে। কচ্ছপের পিঠ এদের পেটের মধ্যে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কোনো কোনো গোসাপের পেটের ভেতর গুবরে পোকা পাওয়া গেছে। এই জাতীয় গোসাপেরা গুবরে পোকা খাবার জন্যে হাতী ও মোষের মলের কাছে ঘোরাফেরা করে।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা কুকুরের সাহায্যে এই সব গোসাপের ডিমের খোঁজ করে এবং তাদের ডিম খায়। কারেন জাতের বন্য মানুষ এই জাতীয় গোসাপ ধরার জন্য নানা রকমের জাল পাতে এবং বাঁশের ফাঁদ বানায়। এরা এই সব গোসাপ ধরে তাদের মাথাটা কেটে ফেলে দেয় এবং ধড়টাকে আগুনে পুড়িয়ে পরমানন্দে খায়। এরা বলে, গোসাপের মাথার মধ্যে বিষ থাকে।

সিংহলী কবরা গোসাপ কাদার মধ্যে থাকতে ভালবাসে। ডাঙ্গায় কেউ তার কাছাকাছি গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে জলের ভেতর ডুবে যায়। এদের পুরো শরীর হলদে লোমে ঢাকা থাকে। এইজন্যে সিংহলবাসীরা একে কবরা গোসাপ বলে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই গোসাপের শরীরের ওপরের চর্বি চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ, কিন্তু শরীরের ভেতরের চর্বি অত্যন্ত বিষাক্ত। সিংহলীরা অত্যন্ত কৌশলে এদের বিষ বের করে এবং গ্রামবাসীদের কাছে তা বিক্রি করে। এই বিষ বের করার জন্য গোসাপদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয়। এখানকার অধিবাসীরা গোসাপের শরীর থেকে এক প্রকার তেলও বের করে। এই তেলকে তারা বলে কবরা তেল।

এই বিচিত্র তেল বের করতে গিয়ে কবরা গোসাপকে অনেক কষ্ট দিতে হয়। খোলা জায়গায় কয়েকটি বড় কড়াই উনানের ওপর চড়ানো হয় এবং অনেক রকমের বিষাক্ত সাপের বিষের সঙ্গে সেসব সাপের মাথার ভেতরের পদার্থ এই সব কড়াইয়ের ভেতর একসঙ্গে ফেলে দেয়া হয়। তারপর এর সঙ্গে সেঁকো বিষ এবং অন্যান্য ওষুধও মেশানো হয়। শেষে এই সব জিনিস মানুষের মাথার খুলির মধ্যে রেখে জ্বাল দেওয়া হয়। সেই খুলির পাশে তিনটি কবরা গোসাপ বাঁধা থাকে। এই তিনটি গোসাপকে উনানের তিন দিকে রাখা হয়। এদের এই সময়ে এমনভাবে পেটানো হয় যে জোরে তাদের শ্বাস পড়তে থাকে এবং এদের ফুঁয়েতে আগুন খুব তীব্রভাবে জ্বলতে থাকে। এদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ফেনাও ঐ মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে ঐ জ্বাল দেওয়া পদার্থের উপর তেলের আস্তরণ পড়ে এবং এই ভাবে কবরা তেল তৈরী হয়। এই তেল বানাবার সময়ে আবার দেবতার উদ্দেশে এক মোরগ বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি কোন গোসাপ কারো বাড়ীতে ঢুকে পড়ে বা ছাদে উঠে যায়, তাহলে সেটা দুর্লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এদের বিশ্বাস সেই বাড়ীতে শীঘ্রই কোনো অসুখ বা মৃত্যু দেখা দেবে। প্রাচীনকালে

আমাদের দেশের চোর ডাকাতেরা উঁচু দেওয়ালে চড়ার জন্য গোসাপের সাহায্য নিত। এই কাজের জন্য তারা একটা বলবান ও শক্তসমর্থ গোসাপকে ধরে তার পেটের একটু ওপরে এক দড়ি কষে বেঁধে দিত। পরে সেই গোসাপকে দেওয়ালের উপর ওঠার জন্যে ছেড়ে দিত। গোসাপটি দেওয়ালের উপরে চড়ে অন্য দিকে লাফিয়ে পড়ত এবং সেইখানেই খুব জোরে নখগুলো ঢুকিয়ে আটকে থাকত। তখন চোর বা ডাকাতের পক্ষে দড়ির সাহায্যে ছাদের উপর উঠে যেতে সুবিধা হত।

পোষা গোসাপ যদি কোন বড় ডিম দেখতে পায় তাহলে সে কিছুক্ষণ ডিমটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে ঘাড় উঁচু করে জিব দিয়ে সেটাকে চেটে পরীক্ষা করে। অবশেষে সেই ডিমটাকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলে এবং গলনালীতে নিয়ে সেটাকে ভেঙ্গে ফেলে। যদি তাকে কোনো পচা ডিম খেতে দেওয়া হয়, তাহলে সেটাকে সে তৎক্ষণাৎ উগরে বাইরে ফেলে দেয় এবং বহুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনির গোসাপ প্রায় ১ মিটারের মত লম্বা হয়। এদের রঙ বাদামী হয় এবং পিঠে ও পায়ে হলদে দাগ থাকে। এদের পেট হলদে রঙের হয়। গোসাপের বিষ সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের ধারণাই ভিত্তিহীন। জীববিজ্ঞানীরা গোসাপের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তার শরীরের কোন অঙ্গেই বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বৈজ্ঞানিকদের মতে, গোসাপ কোনো প্রকার ক্ষতি করে না।

বহুরূপী টিকটিকি

বহুরূপী বর্ণপরিবর্তনশীল টিকটিকি হিসেবে জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু লোকে এদের রঙ বদলাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করে। অনেকের ধারণা, বহুরূপী কৃকলাস হঠাৎ রঙ বদলাতে পারে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কারণ কৃকলাসের রঙ ধীরে ধীরে বদলায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে এরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন করে। আলো এবং উত্তাপের পরিবর্তন এই জীবের দেহের বাহ্য আবরণের উপর প্রভাব তো ফেলেই উপরন্তু কোনো আকস্মিক ঘটনায় ভয় পেয়েও এদের রঙ বদলে যায়।

বহুরূপী বা কৃকলাসের রঙ পরিবর্তনের শক্তি সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। একটি কৃকলাসকে একবার একটি কালো বাক্সে বন্ধ করে রেখে ঐ বাক্সটার উত্তাপ বাড়িয়ে ৭৫ ডিগ্রী পর্যন্ত করা হয়। কিছুক্ষণ পরে কৃকলাসটির রঙ সবুজে পরিণত হয়ে গেল। আবার যখন বাক্সটার উত্তাপ কমিয়ে ৫০ ডিগ্রী করা হল, তখন কৃকলাসটির রঙ বাদামী হয়ে গেল এই বাক্সটির একদিক দিয়ে যখন আলো প্রবেশ করানো হল, তখন আবার কৃকলাসটির শরীরের অর্ধাংশের বাদামী রঙ সবুজ-হলদে হয়ে গেল, অপরার্ধ বাদামীই রয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকেরা এখন জানতে পেরেছেন, যতক্ষণ আলোকরশ্মি কৃকলাসের চোখে না পড়ে ততক্ষণ আলোকের কোনো প্রভাবই কৃকলাসের শরীরে লক্ষ্য করা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা এই সব টিকটিকি সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সে-গুলোর বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক—তিনটি কৃকলাসকে তিনটি পৃথক পৃথক কাচের পাত্রে রাখা হল। প্রথম পাত্রের মধ্যে সবুজ পাতা, দ্বিতীয়টির মধ্যে বাদামী রঙের বস্তু এবং তৃতীয়টির মধ্যে সাদা বালি রেখে দেওয়া হল। কিন্তু তিনটি কৃকলাসের রঙ একরকমই রইল। এ থেকে এটা জানা গেল, কৃকলাসের দেহের রঙের উপর আলোকেরই প্রভাব পড়ে। পরিস্থিতির প্রভাব অতি সামান্যই হয়। যদি এদের শরীরের উপর আলোকসম্পাতের সময়ে মাঝখানে লাল বা সবুজ কাঁচ রেখে দেওয়া যায় তাহলে লাল বা সবুজ আলোর কোনো প্রভাবই এদের শরীরে পড়ে না। এদের রঙ যেমন ছিল তেমনই থাকে। কিন্তু যদি এদের শরীরে নীল অথবা সবজে নীল আলো ফেলা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শরীরে রঙের পরিবর্তন

লক্ষ্য করা যায়। এই রশ্মির প্রভাব ফোটোগ্রাফের প্লেটে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা যদিও প্রমাণিত হয়েছে যে আলোক বা উত্তাপের প্রভাবে অথবা বিহ্বলতার দরুণ কৃকলাসের রঙ বদলায় তবুও সেই পরিবর্তনের ফলে তাদের ত্বকের ওপর কী রকম প্রভাব পড়ে সে সম্বন্ধে এখনও গবেষণা বাকী আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কৃকলাসের ত্বকে অনেক ছোট ছোট বিভিন্ন প্রকারের কণা আছে। এগুলো সম্মিলিত হলে বা পৃথক হয়ে গেলে চামড়ার রঙ পরিবর্তিত হতে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কণাগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রঙ বদলাবার ব্যাপারে এই কণাগুলোই এদের সাহায্য করে।

বহুরূপী খুবই আরামপ্রিয় প্রাণী। এরা খুব ধীরে সুস্থে চলে। এরা কোন গাছের ডাল ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা ঝুলে থাকে, কিন্তু এদের চোখ চারিদিকে মাছি বা অন্য কোন পোকামাকড়ের সন্ধানে ঘুরতে থাকে। এদের চোখ খুব বড় বড় হয় এবং চোখের ওপর একটি পাতলা চামড়ার জাল থাকে। চোখের দুই পাতা মিলে গিয়ে এই জাল তৈরী হয়। এরা যে কোনো একটি চোখকে চারিদিকেই ঘোরাতে পারে। কোনো এক দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য এদের এক চোখকে অন্য চোখের ওপর নির্ভর করতে হয় না। এরা ঘাড় না ঘুরিয়েই উপর নীচে বা সামনে পিছনে দেখতে পারে।

এদের জিব অদ্ভুত ধরণের। জিব পুরো বের হলে তাদের মাথা সমেত পুরো শরীরের সমান লম্বা হয়।

এদের জিব রবারের মত সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। জিবের ডগা চওড়া হয় এবং সেখান থেকে আঠালো লালা বেরোতে থাকে। বহুরূপী কোন উড়ন্ত মাছিকে দেখতে পেলে, ধীরে ধীরে তার দিকে এগোয় এবং কিছুদূর এগিয়ে এসে একটু থামে। তারপরে সামান্য ইতস্তত করার পর হঠাৎ জিবটাকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে মাছিটাকে ধরে ফেলে। এরপর দ্রুত মাছি সমেত জিবটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাছিটাকে খেয়ে ফেলে।

বহুরূপীর পায়ের পাতা দুভাগে ভাগ করা থাকে। সামনের পায়ের আগের দিকে দুটি আঙুল এবং পেছনের দিকে তিনটি করে আঙুল থাকে। কিন্তু পেছনের পায়ের গঠন ঠিক এর বিপরীত হয়।

বহুরূপী বা কৃকলাস খুবই যুদ্ধবাজ প্রাণী। লড়বার সময় এরা ফুসফুসে খুব হাওয়া ভরে নেয়। ফলে তখন এদের খুব মোটা ও বড় দেখায়। এতটা ফোলানো শরীর দেখে লোকে বলে যে এরা বাতাস খেয়েই বেঁচে থাকে।

অনেক কৃকলাস আকারে ছোট হয় এবং ২৫ সেঃ মিটারের বেশী লম্বা হয় না। মাদাগাস্কার দ্বীপের দুই জাতের বহুরূপী তো ৬০ সেঃ মিটারেরও বেশী লম্বা হয় কিন্তু হ্রস্বকায় বহুরূপী ১২ সেঃ মিটার লম্বা হয়। এই হ্রস্বকায় প্রজাতির স্ত্রী কৃকলাস এক সঙ্গে ১২টি বাচ্চা দেয়। কৃকলাস শ্রেণীর প্রাণী-দের মধ্যে একমাত্র এই জাতিই ডিম দেয় না, বাচ্চা দেয়। ভূমিষ্ঠ হবার এক ঘন্টা পরেই এই শাবকেরা মাছি ধরতে আরম্ভ করে। কৃকলাস অন্য জাতির তুলনায় অধিক বলশালী হয়। কিন্তু এদের রঙ বদলাবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

কোনো কোনো জাতের পুরুষ কৃকলাসের চোখের ওপর দুটি লম্বা হাড় উঁচু হয়ে থাকে। এগুলোকে শিং বলে মনে হয়। এই জাতীয় কৃকলাসকে শিংওয়ালা কৃকলাস বলা হয়।

বেঁটে কৃকলাস দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের শরীরের রঙ সবুজ হয় এবং শরীরের দুই দিকেই বড় বড় লাল অংশ থাকে। এছাড়া সম্পূর্ণ শরীরের উপর গাঢ় লাল রঙের দাগ থাকে। রাতেও এদের এই এক রকমই রঙ থাকে। দিনের বেলায় সবুজ রঙ উজ্জ্বল থাকে এবং শরীরের দুই দিকের লাল অংশের মধ্যে কয়েকটি নীল দাগ দেখা

দেয়। ক্রুদ্ধ হলে এদের রঙ ফিকে সবুজে পরিণত হয় এবং লাল অংশ ময়লা বাদামী রঙে রূপান্তরিত হয়। কখনো কখনো বা এদের সম্পূর্ণ শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এই জাতীয় কৃকলাস শীতকালেও আরামে দিন কাটাতে পারে।

সাধারণত উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, স্পেন, দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশেই কৃকলাস বা বহুরূপী দেখা যায়। এরা বেঁটে কৃকলাসের মত শাবকের জন্ম দেয়না, বরং ডিম পাড়ে। অক্টোবর মাসে স্ত্রী-কৃকলাস গাছের ডাল থেকে নীচে নেমে এসে গাছের নিকটেই একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। বসন্ত ঋতুতে এই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোয়। এই সময় পর্যন্ত স্ত্রী-কৃকলাস মাটির মধ্যে এক গর্তে পড়ে থাকে। কারণ এরা শীতকালের ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। আবহাওয়া গরম হবার পরে এরা বাইরে বেরিয়ে আসে।

কোথাও কোথাও কৃকলাস পোষাও হয়ে থাকে। এরা কোনো পাত্র থেকে জলপান করে না। গাছের পাতাঝরা ফোঁটা ফোঁটা জল চেটে নেয়। এরা সাধারণত পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ কিংবা প্রজাপতির ডিমের থেকে বেরোনো ছোট ছোট প্রাণী খায়। কোনো সংবাদপত্রের এক সংবাদদাতা একবার লিখেছিলেন, তিনি কয়েকটি কৃকলাসকে শুধু বাঁধা-কপি সিদ্ধ খাইয়ে বহুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আরো লিখেছেন, এরা ছোট ছোট বাঁধাকপি জিব দিয়ে খায় না। বরং সম্পূর্ণ মুখ খুলে খায়। এরা আজও বেঁচে আছে এবং পাঁচ মাস যাবত বাঁধা-কপি সিদ্ধ খেয়েই জীবনধারণ করছে। প্রতিদিন টাটকা বাঁধাকপি টুকরো টুকরো করে এদের খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এবং সেই সিদ্ধ বাঁধাকপির গন্ধে এরা আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে সেগুলোকে খেতে এগোবার চেষ্টা করে।

এই বিবরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং এর থেকে অনুমিত হয়, এই সব প্রাণীরও বুদ্ধি বিকশিত হতে পারে।

পদহীন টিকটিকি

এই শ্রেণীর অন্তর্গত অন্ধ কীট খুব পরিচিত। ইংল্যান্ড, পশ্চিম এশিয়া এবং আলজিরিয়াতে এই শ্রেণীর জীব খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। এরা গোলাকার ও লম্বা হয় এবং সে কারণে লোকে এদের সাপের শ্রেণীতে ফেলে। কিন্তু সাপের সংগে পার্থক্য হিসেবে এদের কানে ছিদ্র থাকে এবং চোখের পলক পড়ে। এই দুটি লক্ষণের মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করা সম্ভব। এই অন্ধকীটদের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত। এক প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে এরা গরুর রক্ত চুষে খায় এবং লেজ দিয়ে গরুর পা জড়িয়ে ধরে। অন্ধকীট গরুকে কামড়াবার কিছুক্ষণ পরেই গরু মারা যায়।

এখনও কোনো কোনো লোক এই অন্ধকীটকে ভাইপার সাপের চেয়েও বিষাক্ত বলে মনে করে। বস্তুত এই অন্ধকীট খুবই অনিষ্টকর। এদের ছুঁলেও এরা কাউকে কামড়ায় না। দূর থেকে দেখলে এদের অন্ধ বলে মনে হয়। সেজন্য এদের অন্ধ টিকটিকি বলা হয়। কিন্তু আসলে চোখ খুব ছোট হওয়া সত্ত্বেও এরা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

এই সরীসৃপ পূর্ণবয়স্ক হলে লম্বায় প্রায় ৪৫ সেঃ মিঃ হয়। অন্ধকীট বাদামী রঙের হয়। কিন্তু বেশী বয়সের পুরুষদের পিঠ কালো হয়ে যায় এবং তার ওপরে ছোট ছোট নীল রেখা থাকে। কৃষ্ণবর্ণ রেখা কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী অন্ধকীটের শরীরেই দেখতে পাওয়া যায়। পুরো শরীর ছোট ছোট লোমে ঢাকা থাকে এবং সাপের খোলসের মত একবারেই সমস্ত লোম ঝরে যায়। যদি কেউ এদের ধরতে যায়, তাহলে এরা কুঁকড়ে খুব শক্ত হয়ে যায়। এদের শরীর দেয়ালের টিকটিকির লেজের মত হয়। এই অন্ধকীটদের শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে সেই স্থান পূর্ণ হতে অনেক মাস লেগে যায়।

অন্ধকীটেরা কাদা বা ভিজে মাটিতে থাকতেই ভালবাসে। তবে এরা আরামদায়ক রোদ পোহাতে বাইরেও বেরিয়ে আসে। এরা কেঁচো, শামুক এবং

অন্যান্য অনেক প্রকারের কীটপতঙ্গ ধরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। এই দিক দিয়ে এরা সাপের থেকে ভিন্ন। কারণ সাপ যাকে ধরে তাকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে স্ত্রী-অন্ধকীট প্রায় কুড়িটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এই সরীসৃপশিশুরা দুই বা তিন ইঞ্চি লম্বা হয় এবং খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। চার বা পাঁচ বছরে এরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। জনৈক ব্যক্তি এই জাতির এক সরীসৃপকে ধরে ২৩ বৎসর পর্যন্ত লালন পালন করেছিল। তারপর সেটি মারা যায়। —

শীতকালে এরা মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকেই এরা মাটির অনেক নীচে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেখানেই সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। তারপরে মার্চ মাসের শেষে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই অন্ধ টিকটিকিদের পা থাকেনা।

আয়না সাপ

আর এক রকম পদহীন টিকটিকির দেহ কাচের মত মসৃণ হয়। এদের আয়না সাপ বলে। দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের সামনের পা হয়না। পেছনের পাও খুব ছোট এবং ডগার মত বেরিয়ে থাকে।

আয়না সাপ প্রায় ১ মিঃ লম্বা হয়। এদের শরীর হলদে ও বাদামী রঙের চারকোণা চামড়ায় ঢাকা থাকে। এদের বাইরের রূপ এত চকচকে যে মনে হয় এদের শরীর বুঝিবা পালিশ করা হয়েছে। এদের শরীর খুব শক্ত। এরা অনায়াসে শরীর ঘোরাতে পারে না।

আয়না সাপ এমনিতে খুব হিংস্র প্রকৃতির হয়। কিন্তু ধরে রাখতে পারলে কিছুদিন পরে পোষ মানে এবং হাতের তালুতে রাখা জিনিস খেতে শেখে। এরা ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী খায়। কখনো কখনো ভাইপার সাপকে পর্যন্ত মেরে খেয়ে ফেলে। কখনো বা শামুক, পাখীর ডিম বা পক্ষীশাবক ধরে খায়।

এই জাতীয় সরীসৃপদের শরীর কাচের মত শক্ত ও ভঙ্গুর হওয়ার জন্য এদের আয়না সাপ বলা হয়। এরা হঠাৎই এদের লেজ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এদের শরীরের ত্বক কাচের মতই চকচকে হয়। কিংবদন্তী আছে, এরা এদের লেজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেটির খোঁজ করতে থাকে এবং পাওয়া গেলে সেই বিচ্ছিন্ন পুচ্ছটিকে শরীরের যথাস্থানে সংযুক্ত করে নেয় কিংবা সেই বিচ্ছিন্ন পুচ্ছটিই নিজে থেকে সরে সরে এসে ধড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তবে এরকম দৃশ্য এখন পর্যন্ত চাক্ষুষ দেখা যায় নি।

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনিতে আর এক প্রকার পদহীন টিকটিকির সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতির পা থাকেই না, আবার অন্য কোনো প্রজাতির পিছনের পায়ের কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় টিকটিকি ই মিটারের মত লম্বা হয় এবং এদের লেজের দুই তৃতীয়াংশ খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। অনেক সময় লোকে এদের সাপ বলে মনে করে। পদহীন টিকটিকির মধ্যে মধ্য আমেরিকার টিকটিকি অত্যন্ত অদ্ভুত। এদের হলদে শরীরে কালো কালো দাগ থাকে। এই অসাধারণ জাতের টিকটিকি ৪৫ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। এরা পিঁপড়ের গর্তে বাস করতে খুব ভালবাসে। ব্যাট সাহেবের মতে, ঐ জায়গার অধিবাসীরা এই সরীসৃপকে পিঁপড়ের মা বলে মনে করে। লোকের ধারণা, এরা বিষধর, কিন্তু আসলে এরা নির্বিষ। আমেরিকাবাসীরা বলে, পিঁপড়েরা এদের অত্যন্ত যত্নে রাখে। যদি কোনো টিকটিকি এদের গর্ত থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তারাও সদলে সেই গর্ত ছেড়ে চলে যায়।

উড়ন্ত টিকটিকি

সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী একদা উড়বার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল। কয়েক জাতের সরীসৃপ এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছিল। প্রাচীনকালে টেরোড্যাক্‌টাইল উড়তে সক্ষম

হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে কোনো কারণে ঐ জাতীয় প্রাণী লোপ পেয়ে গেল। এখন তাদের ফসিলই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগেও এক প্রকারের টিকটিকি উড়তে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত এদের ১২টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতের মাদ্রাজে, মালয় উপদ্বীপে, সুমাত্রায়, জাভায় এবং বোর্ণিয়োতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা প্রায় ২৫ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। আর এদের লেজ মাত্র ১২ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। আসলে এরা উড়তে পারে না, তবে ওপর থেকে লাফিয়ে ১৮ মিটারেরও বেশী দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এই সময় এদের শরীরের দুদিকের বড় বড় রোমশ চামড়া হাওয়ায় ভাসতে এদের সহায়তা করে। তার পরে তারা মাটিতে পড়ে যায়। দুদিকের বড় বড় ছাল পাঁজরের হাড়ের সাহায্যে পাখার মত ছড়িয়ে থাকে। এরা পাঁজরের হাড়গুলিকে সামনে পেছনে সরাতে পারে। বিশ্রাম নেবার সময় এরা পাঁজরের হাড় এবং পাখা দুটো পিঠ ও ঘাড়ের দুই দিকে পাট করে শুইয়ে রাখে এবং বাতাসের বেগের সময় এগুলো উড়ো জাহাজের পাখার মত ছড়িয়ে যায়। মালয় উপ-দ্বীপের উড়ন্ত টিকটিকিদের দৈর্ঘ্য এক ফুট হয়। চলাফেরার সময়ে এদের কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। কিন্তু উড়বার সময়ে এরা সুন্দর প্রজাপতির মত হয়ে যায়। কারণ তখন এদের ডানা গাঢ় কমলা-লেবুর রঙের হয় এবং তার ওপরে কালো-রঙের ডোরা কাটা থাকে।

এই জাতের টিকটিকি দূর থেকে দেখলে অন্যান্য জাতের টিকটিকির মতই মনে হয়। কেবল ঐ ডানা এবং পাঁজরের জন্যই এরা অন্যান্য টিকটিকির থেকে পৃথক শ্রেণীর বলে বোঝা যায়। এদের শরীরের রঙ গাঢ় বাদামী হয়। কিন্তু তার ওপরে কালো কালো দাগ থাকে। এরা সাধারণত গভীর অরণ্যে বাস করে। এদের প্রজাপতির গায়ের রঙের মত ডানাগুলো চিত্রবিচিত্র ফুলের মধ্যে মিশে থাকতে সুবিধা হয়। এজন্য শত্রুরা সহজে এদের ধরতে পারে না।

কুমীর

কুমীরের সঙ্গে তো সকলেই পরিচিত। এই প্রাণীর কাছে যেতে কারো সাহস হয় না। এরা ডাঙ্গায় সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে না। এজন্য এরা বেশীর ভাগ সময় জলেই বাস করে এবং ইতস্তত সাঁতার কেটে বেড়ায়। এদের নাক এবং চোখ মাথার ওপরে উঠে থাকে। এই জন্য এরা সাঁতরাবার সময় শরীর জলে ডুবিয়ে রেখেও সর্বদা শ্বাস নিতে পারে ও এদিক ওদিকে দেখতে পারে। এদের দাঁত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়। দাঁতগুলো চোয়ালের মধ্যে লাগানো থাকে। এদের দাঁত ধীরে ধীরে পড়ে যায়। শূন্যস্থানে আবার নতুন দাঁত গজায়।

কুমীর এবং এই জাতীয় সমস্ত প্রাণীই ডিম থেকে জন্মায়। এই ডিমের ওপরের খোসা সাদা ও শক্ত হয়। ডিমের মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র শাবকের নাকের কাছে একটি কাঁটা থাকে। এটাকে ডিমের দাঁত বলা হয়। এই দাঁতের সাহায্যে বাচ্চাগুলো ডিমের খোলটাকে ভেঙ্গে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে বের হবার কিছুদিন পরেই এদের এই দাঁত পড়ে যায়।

কুমীর ১২ জাতের হয়। প্রধানত আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকাতে এদের দেখা যায়। নীল নদের কুমীরদের প্রাচীন মিশরবাসীরা বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। কোনো কোনো নগরে তারা কুমীরদের লালন-পালনও করত। তাদের কান ও সামনের পায়ে সোনার বালা ও বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়ে রাখত। তাদের মৃত্যু হলে শবদেহগুলোকে সুগন্ধি দ্রব্যে ঢেকে গোর দেওয়া হত। সেই গোরস্থানে কবরও নির্মাণ করা হত। মিশরবাসীরা এদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করত। হেরোডোটাস লিখে গেছেন, লোকেরা কুমীরকে ভাজা মাংস, রুটির টুকরো এবং মদ খেতে দিত।

নীল নদের কুমীর মানুষ খেত। সেজন্য ওখানকার লোকেরা অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত থাকত। যেখানে এই কুমীর থাকত, লোকেরা ভয়ে সে তল্লাটই ছেড়ে চলে যেত। একবার একটা কুমীর নাকি জনৈক ঘোড়-সওয়ারকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে মেরে ফেলেছিল। আর একবার এক কুমীরের পেটের মধ্যে থেকে প্রায় ১৪ কিঃগ্রাঃ ওজনের সোনা পাওয়া গিয়েছিল। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই কুমীররা মানুষ-খেকো ছিল। অন্য এক ঘড়িয়ালের পেটের মধ্যে ১১ গাছা হাতের চুড়ি, তিনটি সোনার বড় বাজুবন্ধ, গলার হার, একটি ঘড়ি, হাতের ও পায়ের ১৪টি হাড় এবং তিনটি স্তন্যপায়ী জীবের মেরুদণ্ডের হাড় পাওয়া গিয়েছিল। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এই জিনিসগুলো দেখানো হয়।

কুমীরের চামড়া অনেক কাজে লাগে। প্রাচীন মিশর দেশের অধিবাসীরা এর চামড়া দিয়ে অস্ত্র তৈরী করত। লোকে তো কুমীরের মাংসও খায়। ম্যাডান সাহেব লিখেছেন, এদের মাংস দেখতে এবং খেতে কাঁকড়ার মাংসের মত হয়। আবার কারো কারো মতে, এদের মাংস টার্জন মাছের মাংসের মত। স্বাদ যেরকমই হোক না কেন, খুব কম লোকেই কুমীরের মাংস খায়।

নীল নদের কুমীর প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা দিনের বেলায় বালির ওপর শুয়ে থাকবার জন্যে জল থেকে উঠে আসে এবং মুখ খোলা অবস্থায় পড়ে থাকে। তখন এদের মুখের উপর ছোট ছোট পাখী এসে বসে এবং মুখের উপর হেঁটে বেড়ানো কীটপতঙ্গ আরাম করে খেতে থাকে। কিন্তু

কুমীররা তখন নিশ্চলভাবে খুব আরাম করে শুয়ে থাকে।

বসন্তকালে স্ত্রী-কুমীর বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ৪০ থেকে ৬০টি ডিম পাড়ে। তারপরে সে গর্তটিকে ঢেকে দেয়। কখনো কখনো দেখা যায়, মাদী কুমীর সেই জায়গাতেই বসে থাকে। চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বোরোয়। মা কুমীর বালি খুঁড়ে বাচ্চাদের বের করে আনে। গর্ত থেকে বেরিয়েই এই বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে জলের ভেতর চলে যায়। মানুষখেকো কুমীর ভারত থেকে আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়াতে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এরা ৬ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কুমীরের চেয়ে এরা অধিক ভয়ঙ্কর হয়। ডিম পাড়ার সময়ে তো এরা এমন হিংস্র হয়ে পড়ে যে ছোট ছোট নৌকাকে পর্যন্ত আক্রমণ করে এবং নৌকার আরোহীদের খেয়ে ফেলে। এদের ধরবার জন্যে অনেক কৌশলের কথা ভাবা হয়েছে এবং সে কৌশল প্রয়োগ করাও হচ্ছে। মিঃ লেডীকর এই রকম এক কৌশলের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কুমীরের কবলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল যে জায়গায়, এক শিকারী তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় চড়ে সে জায়গায় গেল। কিছুক্ষণ পরে কুমীরটাকে জলে সাঁতার দিতে দেখা গেল। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ জলে লাফিয়ে পড়ে দুই হাত দিয়ে জলে থপ থপ শব্দ করতে আরম্ভ করল। উদ্দেশ্য, যাতে ঐ মানুষখেকো কুমীরটি তার কাছে আসে। কুমীরটি অবিলম্বে জলে ডুব দিল এবং খুব দ্রুতবেগে বালকটি যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে এসে মাথা তুলল। এর-মধ্যে বালকটি তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে পড়েছিল। কুমীর মাথা উঁচু করা মাত্র তার উপর বল্লম মারা হল এবং সেইখানেই সে খাবি খেতে শুরু করল।"

কোনো কোনো কুমীর কাদায় থাকে। ভারতবর্ষ এবং শ্রীলঙ্কার নদী ও হ্রদে এদের দেখতে পাওয়া যায়। কখনো কখনো মালয় দ্বীপপুঞ্জেও এদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা সাধারণত ৩½ মিটারের বেশী লম্বা হয় না কিন্তু খুব ভীরু স্বভাবের হয়। এই জাতের কুমীররা খুব তাড়াতাড়ি পোষ মানে এবং মানুষের হাত থেকে খাদ্য খায়। গ্রীষ্মকালে যখন জল শুকিয়ে যায়, তখন এরা ডাঙ্গায় উঠে নতুন নদী বা দিঘির খোঁজ করতে থাকে। কখনো এরা শুকনো নদী বা পুকুরের নীচে কাদার ভেতর পর্যন্ত চলে যায় এবং বর্ষাকালে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।

গঙ্গা, সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর জলে অতি বিশাল আকৃতির কুমীর দেখতে পাওয়া যায়। এরা ৯ মিটারেরও বেশী লম্বা হয়। এদের মুখ লম্বা হয় এবং মুখের অগ্রভাগে একটি থুতনি থাকে। যেসব কুমীর মাছ খায় তারা মানুষকে আক্রমণ করে না। কখনো কখনো কুমীরের পেটে মানুষের হাড়ও পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা মানুষও খায়।

বৈজ্ঞানিক সুইন হো ১৮৭০ সালে জীব-বিজ্ঞানীদের সামনে সর্বপ্রথম চীনে কুমীর প্রদর্শন করেছিলেন। মার্কিনী কুমীর এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে অনেক দেখা যায়। কিন্তু ক্রমাগত ধরা পড়ায় কোনো কোনো জায়গায় এদের অবলুপ্তি ঘটেছে। চামড়ার জন্যই ওদের ধরা হয়। এই চামড়া দিয়ে সুটকেস, বাক্স প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈরী হয়। একবার শুধুমাত্র নিউ অর্লিন্স সহর থেকেই ১০,০০০ কুমীরের চামড়া বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছিল। এরা লম্বায় ৪½ মিঃ হয়।

নিউইয়র্কের পশুশালায় একবার এক কুমীরের বাচ্চা আনা হয়েছিল। তখন সেটি লম্বায় প্রায় ২০ সেঃ মিঃ এবং ওজনে ৩০০ গ্রাম ছিল। প্রথম বছরে সেটি ৭৫ সেঃ মিঃ লম্বা এবং প্রায় ১·৪০ কিঃ গ্রাঃ ওজনের হয়ে গেল। দ্বিতীয় বৎসরে ৯০ সেঃ মিঃ লম্বা এবং ৬½ কিঃ গ্রাঃ ওজনে ভারী হয়ে পড়ল। তৃতীয় বর্ষে সেটি প্রায় ২ মিঃ লম্বা এবং ওজনে ২৫ কিঃ গ্রাঃ হয়ে গেল। এইভাবে চার বছরের পরে

সেটি প্রায় ৩ মিঃ লম্বা এবং ৮০ কিঃ গ্রাঃ ওজনের হয়ে গেল। মার্কিনী কুমীর বসন্তকালে ৩০ থেকে ৪০টি ডিম দেয়। মা কুমীর ঘাসপাতা দিয়ে তৈরী বাসাতে এদের রেখে দেয় এবং চারদিকে বড় বড় পাতা ও ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেয়। এই রকমের বাসায় এদের শরীর বেশ গরম থাকে। দুমাস পরে এই ডিমগুলোর ভেতর থেকে ছানা বেরোয়।

চীনে কুমীর মাত্র ২ মিঃ লম্বা হয়। মার্কিনী কুমীরের সঙ্গে এদের অনেক তফাৎ। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতেও কিছু কিছু কুমীর দেখা যায়। কিন্তু আগে যে সব কুমীরের কথা বলা হয়েছে তাদের থেকে এরা অনেক বিষয়ে আলাদা। এই জাতের মধ্যে কালো কুমীর বিরাট আকারের হয়। এরা ৬ মিঃ লম্বা হয়। বেট সাহেব আমেরিকায় নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখতে পান যে দুটো কুমীর জলের ধারে চুপচাপ শুয়ে চারদিকে লক্ষ্য করছিল। ভাবখানা এমন যে—যদি কোনো কুকুর, ভেড়া, শুকর বা মানুষ তাদের ধারে কাছে আসে তাহলে তারা তক্ষুণি তাকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। লোকেরাও খুবই সাবধানে স্নান করছিল এবং তাদের দৃষ্টিও কুমীর দুটির ঘোরানো চোখের দিকে সর্বদা নিবদ্ধ ছিল। এদের মাথা এবং চোখ দুটিই শুধু জলের উপরে থাকে। বিস্ময়ের কথা, এই জাতীয় কুমীরের এক অন্য প্রজাতির চোখের চারধারে চশমার চিহ্ন আঁকা থাকে। যার জন্য এদের চশমা আঁটা কুমীর বলা হয়। কিন্তু লম্বায় এরা খুব ছোট। মাত্র ২২ মিটার।

কচ্ছপ

কচ্ছপ আমাদের অতি পরিচিত জীব। অনেক ধর্মপ্রাণ লোক নদীর ধারে গিয়ে কচ্ছপদের আটার গুলিও খাইয়ে থাকেন। বাইরে থেকে কচ্ছপের আকৃতি দেখলে মনে হয় যে এরা জাতিগতভাবে কুমীর বা টিকটিকি থেকে পৃথক এবং এদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বস্তুত সকলেই সেই বিশাল সরীসৃপ পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। এদের শরীর বাইরের থেকে এক কঠিন খোলা দিয়ে ঢাকা। এই আবরণের মধ্যেই এরা মুখ মাথা এবং হাত পা গুটিয়ে রাখে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কচ্ছপ যেভাবে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের মধ্যে সঙ্কুচিত করে রাখে, মানুষেরও ঠিক সেইভাবে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের বশে রাখা উচিত।

স্থলচর কচ্ছপ

কচ্ছপের কঠিন বাহ্য আবরণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা লিখেছেন, এক সময়ে কচ্ছপের শরীর কঠিন ত্বকে আবৃত ছিল এবং এই ত্বকের নীচে মাংসের মোটা স্তর ছিল। মাংসের ভাঁজে ভাঁজে ছোট ছোট হাড়ের টুকরো ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত হাড়ের টুকরোগুলো এক সঙ্গে জুড়ে গেল এবং তার ফলে এক সুকঠিন খুলির আকারে পরিণত হল। পেটের দিকের মাংসও ধীরে ধীরে কমতে লাগল এবং এর ফলে পেটের দিকের হাড়গুলোও ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত মেরুদন্ডের হাড়গুলোর সঙ্গে জুড়ে গেল। অনেক যুগ পার হবার পরে পাঁজরার হাড় উপরের শক্ত খুলির সঙ্গে জুড়ে গেল এবং পেটের হাড়গুলোও বুকের হাড়ের সঙ্গে জুড়ে গেল। কোনো কোনো কচ্ছপের শরীরের গঠন থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

কচ্ছপের গতি খুব মন্থর। পিঠের জন্যই তার এই অবস্থা। এই কঠিন খোলের মধ্যেই এরা হাত পা চালাতে পারে। বড় জোর তারা ধীরে ধীরে কিছুদূর পর্যন্ত চলতে পারে। গলা এবং লেজ ছাড়া এরা মেরুদণ্ডের কোনো হাড়কেই নাড়াতে চাড়াতে পারে না। কচ্ছপের চোখ খুব বড় বড় হয় এবং চোখের উপর ঝিল্লী থাকে। অধিকাংশ কচ্ছপ তাদের মাথা, হাত, পা এবং লেজকে পিঠের ভেতর টেনে নেয়। কিন্তু এমনও কিছু কচ্ছপ আছে যাদের মাথার ওপর আরো একটি হাড়ের টুকরো থাকে যেটা মুখ ভিতরে ঢুকিয়ে নেবার পরে সামনের ছিদ্রটিকে বন্ধ করে দেয়। এই রকম কচ্ছপকে দূর থেকে দেখলে একটা বন্ধ বাক্সের মত মনে হয়।

কচ্ছপ অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস নেয়। অন্যান্য প্রাণীর মত এরা পাঁজরের হাড় নড়াচড়া করতে পারে না। বরং সে হাড় এক স্থানেই স্থির থাকে এবং আমাদের পাঁজরের হাড়ের মত তা সঙ্কোচন-প্রসারণশীল নয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এরা ওঠানামাও করে না। নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে ওরা মুখের মধ্যে হাওয়া ভরে নেয়। তারপরে ধীরে ধীরে জিভ ওপরে এনে নাকের ছিদ্রদুটির কাছে নিয়ে যায়। ফলে মুখের ভেতরের হাওয়া শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে ফুসফুসে চলে যায়। তার পরে জিভটা আবার নীচে নামিয়ে আনে। যদি কচ্ছপের নাকে মোম লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুক্ষণ পরে তার দম বন্ধ হয়ে যায় এবং অবশেষে সে মরে যায়। কচ্ছপের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এরা না খেয়ে অনেক মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যদি এদের মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় কিংবা তা বের করে নেওয়া যায় তাহলেও এরা চলাফেরা করতে পারে। শুধু এই নয়, যদি এদের হৃদ্‌পিন্ড ভিন্ন অন্য সমস্ত অঙ্গ শরীর থেকে বের করে নেওয়া হয়, তাহলেও এদের

হৃদ্‌পিন্ড দুই বা তিন দিন পর্যন্ত স্পন্দিত হতে থাকে।

শীতোষ্ণ প্রদেশে শীতকালে কচ্ছপেরা মাটির তলায় ঢুকে যায় এবং কোনো কিছু না খেয়ে পড়ে থাকে। স্থলকচ্ছপ নিরামিষভোজী এবং জলচর কচ্ছপ আমিষাশী হয়। স্থলচর কচ্ছপ খুব আগ্রহের সঙ্গে কপিপাতা খায়। ছোট ছোট কচ্ছপেরা শাক-পাতাও খায়। যদি এদের বাগানে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে এরা সামনে যা পাবে তাই খেয়ে নেবে। ভাল ভাল ফুল গাছের চারাগুলোকে এরা অবিলম্বে চেটে খেয়ে ফেলে। অধিকাংশ লোকের ধারণা, কচ্ছপেরা নিরেট মূর্খ। কিন্তু বস্তুত তা ঠিক নয়। কারণ এদের যদি পোষ মানানো যায়, তবে এদের মানুষের হাত থেকে খাবারও খাওয়ানো যেতে পারে। ওরা তখন বুঝতে পারে, ওদের পালক কে। বাগানের মধ্যে ওরা নিজের বাসস্থান খুঁজে ঠিক করে নেয় এবং প্রতিদিন ঘোরাফেরার পরে ঠিক সেই জায়গায় চলে যায়। কচ্ছপ সব সময় এক রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করে। এসব থেকে বোঝা যায়, কচ্ছপের স্থান ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে।

বেরিজ সাহেব একবার এক কচ্ছপকে নিজের বাগানে রেখেছিলেন। তার এক কুঅভ্যাস ছিল। সে প্রতিদিন সূর্যমুখী ফুলের গাছের কেয়ারির মধ্যে গিয়ে বসত যার ফলে গাছের নরম ডাঁটাগুলি ঝরে পড়ে যেত। বেরিজ সাহেব বার বার তাকে উঠিয়ে অন্য এক কোণে বসিয়ে দিতেন। কিন্তু সে বারবারই সেই স্থানে চলে আসত। এর দ্বারা জানা যায় যে কচ্ছপের স্মরণশক্তিও অসাধারণ। ইয়োরোপে তিন জাতের স্থল কচ্ছপ দেখা যায়। এদের নাম আইবে-রিয়ান, গ্রীসিয়ান এবং মারজিন্ড। আইবেরিয়ান কচ্ছপের সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। কারণ এরা বাইরে থেকে আসা যাওয়া করে। এরা সাধারণত ২৩ সেঃ মিটারের বেশী লম্বা হয় না এবং এদের উরুতে এক ত্রিকোণ কাঁটার মত থাকে। এই চিহ্নের দ্বারা এদের অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রাণীর থেকে পৃথক বলে চিনে নেওয়া যায়। ইয়োরোপের সব দেশেই এই জাতীয় কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায়। এশিয়া ও আফ্রিকাতেও এদের দেখা যায়। এরা অনেক বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। লোকে বলে, ইংল্যান্ডে এই জাতের এক কচ্ছপ ৯৬ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল। কুমারী ডি, জেঙ্কিন্স এই কচ্ছপটির এরকম বিবরণ দিয়েছেনঃ

"আমার পিতৃব্য এখন ৯০ বৎসর বয়স্ক। তিনি বলেন, যখন তিনি ছোট ছিলেন তখন থেকেই এই কচ্ছপটি জীবিত রয়েছে এবং সেই সময়ও কচ্ছপটি এতই বড় ছিল। অক্টোবর মাসে সে মাটির নীচে ঢুকে যায় এবং মার্চ মাসে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসার পরে তার জিভ কালো থাকে। তিন চার সপ্তাহ পরে সেটা লাল হতে আরম্ভ করে। এর পরে সে খেতে আরম্ভ করে। ছোট ছোট চারা গাছ খায়। কখনো কখনো মটর, কুল, ট্যাপারী বা শাকের চারাও সানন্দে খেয়ে থাকে। সে পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলাফেরা করে। গরমের সময় কচ্ছপটি খুব খুশী থাকে মনে হয়। মালীকে ভীষণভাবে তাড়া করে। তার জামা ছিঁড়ে দেয়, পা কামড়ে দেয়। এজন্য মালী নিজের কাজ ঠিকমত করতে পারে না। অতএব সে তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে। এই কচ্ছপটিকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখানে এনেছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিল।"

গ্রীসদেশের কচ্ছপ আইবেরিয়ন কচ্ছপের মতই হয়। প্রভেদ এইমাত্র যে এদের উরুতে কাঁটা থাকে না। গ্রীস দেশের লোকেরা এই কচ্ছপ খেয়ে থাকে। এদের মস্তিষ্ক এবং মাংস শিককাবাব করে ভেজে তারা খায়। এই খাদ্য তৈরী করতে খুবই দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োজন হয়। খুব সাবধানে একে কাটতে হয়, কারণ এই কচ্ছপরা মাথাটাকে খোলের ভেতরে দ্রুত ঢুকিয়ে নেয়। এই কাজে দক্ষ লোকেরা জানে, এদের লেজে সুড়সুড়ি দিলেই এরা গলা বাইবে বের করে আনে এবং তখন

ধারালো বঁটি দিয়ে এদের গলা কেটে নিতে হয়। ফ্রান্স দেশের সৈনিকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এই কাজ করে। তারা জ্বলন্ত অঙ্গার কচ্ছপের উপর রেখে দেয় যার ফলে কচ্ছপটি খোলের মধ্য থেকে মাথা বাইরে বের করে আনে।

কচ্ছপ সঙ্গীহীন হয়ে থাকতে পারে না। সাথীহারা হলে এরা বসন্তকালে আনচান করে এবং সাথীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কচ্ছপের পিঠের গঠন দেখে স্ত্রী-পুরুষ কচ্ছপের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। পুরুষ-কচ্ছপের পিঠ অর্ধচন্দ্রের মত হয় এবং স্ত্রী-কচ্ছপের পিঠ চ্যাপ্টা হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রকারের মায়াজিন্ড জাতীয় কচ্ছপ ইউনান এবং সারডিনিয়ার কয়েকটি প্রদেশে দেখা যায়। এদের পিঠের পেছনের দিকটা উঁচু হয়ে থাকে। এই লক্ষণ থেকে এদের চেনা যায়। আমেরিকার ডাব্বানুমা কচ্ছপ জলচর ও স্থলচর কচ্ছপের মাঝামাঝি গোছের। এদের পিছনের পাগুলোতে ঝিল্লীও থাকে। এরা নিরামিষ-ভোজী হলেও কখনো কখনো কেঁচো, ব্যাঙ ইত্যাদি খেয়ে ফেলে। এদের খোঁচাখুঁচি করলে এরা মুখ, হাত, পা সব শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে এবং নিজের শরীরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে। এই জন্যই এদের 'বক্স টরটয়েজ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এই জাতীয় কচ্ছপের মধ্যে 'ক্যারোলিনা বক্স টরটয়েজ' দর্শনীয় জীব। এদের মাথা, হাত, পা এবং চামড়ার ওপর হলদে এবং কালো ডোরা থাকে। সেজন্য এই জাতের অন্য কোনো প্রাণীর সঙ্গে এদের মিল নেই। এরা বনে বাস করে এবং কুল, গাছের চারার নিম্নাংশ, কেঁচো এবং কীটপতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকে। ডিটম্যান সাহেবের মতে, যখন এক রকমের কালো জাম খুব বেশী পরিমাণে ফলে, সে সময় এই জাতীয় কচ্ছপের সামনের দাঁতগুলো জামের রসে ভরে যায়। বর্তমানে এই শ্রেণীর কচ্ছপের অভাব দেখা দিয়েছে। মার্কিন সরকারের আইন অনুযায়ী এদের ধরা বা দেশের বাইরে পাঠানো দণ্ডনীয় অপরাধ।

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে এক অদ্ভুত ধরণের কচ্ছপ দেখা যায় যাকে গোফর কচ্ছপ বলা হয়ে থাকে। এরা অধিকাংশ সময় নিজেদের গর্তের মধ্যেই থাকে। এরা পায়ের সাহায্যে বালুকাময় স্থানে গর্ত খোঁড়ে। এই গর্ত ৬ মিটারের মত লম্বা এবং ৩ মিঃ গভীর হয়। স্ত্রী-কচ্ছপরা এই গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না। ডিম পাড়ার জন্য এরা অন্য গর্ত খোঁড়ে।

লোবরিজ সাহেব ১৯২০ সালে এক নতুন ধরণের কচ্ছপ সংগ্রহ করেছিলেন। এদের কোমল পিঠওলা কচ্ছপ বলা হয়ে থাকে। ইনি লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এই রকমের দুটি কচ্ছপ পাঠিয়েছিলেন। এদের দৈর্ঘ্য ছিল ২০ সেঃ মিঃ এবং উচ্চতা ৫ সেঃ মিঃ। এদের পিঠ অত্যন্ত কোমল হয় এবং তাতে আঙুল দিয়ে সহজে চাপও দেওয়া যায়। এজন্য এরা পাথরের ফাটলের মধ্যে বাস করে। মিঃ লোবরিজ একবার এই জাতের একটি প্রাণীকে গর্ত থেকে ধরতে চেষ্টা করে খুব মুশকিলে পড়েছিলেন। কারণ কচ্ছপটি গর্তের মধ্যে শরীরটাকে ফুলিয়ে দিয়েছিল যার জন্য তাকে টেনে বের করা সম্ভবই হল না। এরা অন্য প্রজাতির কচ্ছপ থেকে অনেক বেশী চঞ্চল স্বভাবের হয় এবং খুব দ্রুত মাটির ওপর চলাফেরা করতে পারে।

কোনা কোনো জাতের কচ্ছপ খুব সুন্দর হয়। এদের পিঠ বেশ সুন্দর হয় এবং তাতে নানা রঙের চিত্রবিচিত্র থাকে। এই রকমের কচ্ছপ ভারত এবং শ্রীলংকায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের পিঠ উঁচু হয় এবং তার ওপরে গোলাকার চক্রও থাকে। পিঠের রঙ কালো হয় এবং তার উঁচু অগ্রভাগগুলো হলদে রঙের হয়। এই অগ্রভাগগুলো থেকেই চার-দিকে হলদে রেখা বিস্তৃত হয়ে থাকে। পেটের ওপরেও অনেক হলুদ রেখা দেখা যায়। স্ত্রী-কচ্ছপ নিজের ডিমগুলোকে নিরাপদ স্থানে রাখে। একটা গর্ত বানিয়ে সে তার মধ্যে ডিমগুলোকে রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। আর সেই মাটি এমন করে চেপে দেয় যে ওপর থেকে দেখে মাটির তলায় কোনো

জিনিস আছে বলে কেউ টের পায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপেও এই রকম সুন্দর কচ্ছপ কিছু পাওয়া যায়। এদের রঙ কালো হয় এবং তার ওপরে হলদে রেখা থাকে। সেখানকার অধিবাসীরা এই কচ্ছপকে ভীষণ ভয় পায়। মিঃ বোলেঞ্জর জানিয়েছেন, লোকে এদের স্পর্শ করা বা বিক্রয় করাকে অশুভ বলে মনে করে। এজন্য এখানকার লোকেরা এই জাতীয় কচ্ছপ ও তাদের ডিম স্পর্শ করে না।

পৃথিবীতে বৃহৎ কচ্ছপের বংশ এখন ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এক সময় ছিল যখন উত্তর আমেরিকা, ভারতবর্ষ এবং ইয়োরোপে কচ্ছপ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এই জাতের কচ্ছপ কেবলমাত্র গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপেই পাওয়া যায়। সেখানেও এদের সংখ্যা মাত্র ১৩। চিড়িয়াখানাগুলোতেও কিছু কিছু দেখা যায়। দু-একটা কচ্ছপ ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় যে নিকট ভবিষ্যতে এই প্রাণী ফসিলে পরিণত হয়ে যাবে। গ্যালাপ্যাগোসের কোনো কোনো দ্বীপে তো এখন এই শ্রেণীর কচ্ছপের চিহ্নমাত্র নেই। জীবিত কচ্ছপজাতির মধ্যে এরাই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার। এরা প্রায় ২ মিঃ লম্বা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারউইন তাঁর গ্রন্থে এই প্রাণী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর সময়ে এই প্রাণীটির আধিক্য ছিল এবং এরা পাহাড়ে ও নরম মাটিতে বসবাস করত। এদের মধ্যে কোনো কোনো পুরুষ-কচ্ছপের এত ওজন হত যে তাদের ওঠাবার জন্যে সাত বা আটজন মানুষের দরকার হত। যেসব দ্বীপে জল ছিলনা কিম্বা কোনো প্রকারের জীবজন্তু বা গাছপালা জন্মাত না, সেই সব স্থানের রসালো ফণিমনসা ডালের ওপর নির্ভর করেই এরা বেঁচে থাকত। যে কচ্ছপেরা উঁচু জায়গায় বাস করত তারা সেখানকার ঘাসপাতা ও শ্যাওলা খেয়ে জীবনধারণ করত। জলের খোঁজে এরা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেত। এদের চলাচলের দরুণ এক প্রকার রাস্তাও তৈরী হয়ে যেত। ঝরণা বা জলের উৎসমুখে এই রকমের অনেক প্রাণী জল খাবার জন্য একত্রিত হত। অতি দ্রুতবেগে এই কচ্ছপের দল জলের দিকে ধাবমান হত। জলের কাছাকাছি হওয়া মাত্র এরা মাথা বের করে জলের মধ্যে এগিয়ে দিত এবং প্রাণ ভরে জল পান করত। দ্বিতীয় দল ততক্ষণে জল খেয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যেতে থাকত। ডারউইন সাহেব লিখেছেন, এই দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। ঝরণার জলের দিকে যাবার সময় এদের গতিবেগ প্রতিদিন ৭ কিঃ মিঃ মত হত। সেখানে পৌঁছে এরা তিন বা চার দিন থাকবার পর আবার ফিরে যেত।

আগেকার দিনে লোকেরা কচ্ছপের মাংস বেশী পরিমানে খেতো এবং নাবিকরা এই সব দ্বীপে জাহাজ থামিয়ে এদের সংগ্রহ করত। ১৮২৫ সালে ক্যাপ্টেন মোরেল লিখেছিলেন; একবার বিদেশযাত্রী জাহাজের নাবিকরা রসদের জন্যে ৬০০ থেকে ৯০০ বৃহদাকার কচ্ছপ সংগ্রহ করে রেখেছিল। এইসব কারণেই এই বৃহৎ কচ্ছপ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

আর এক রকমের বৃহদাকার কচ্ছপের নাম এলিফ্যানটাইন কচ্ছপ। ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপগুলোর সরকারী আইনে এদের মারা নিষিদ্ধ। এই কচ্ছপ এত বড় হয় যে একটি বালক এদের পিঠে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে।

জলচর কচ্ছপ

জলচর কচ্ছপ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সর্বদা জলেই থাকে ; আর কিছু জলে ও স্থলে সমভাবেই বিচরণ করে। আবার কতকগুলো শুধুমাত্র সমুদ্রেই বসবাস করে। ইয়োরোপের স্বচ্ছজলবাসী কচ্ছপ জলে এবং স্থলে দু'জায়গাতেই থাকে। এই শ্রেণীর কচ্ছপ বাইরেও রপ্তানী করা হয়ে থাকে। এ ধরণের কচ্ছপ অধিক সংখ্যায় উত্তর ও মধ্য ইয়োরোপ, এশিয়া মাইনর এবং উত্তর আফ্রিকায় দেখা যায়। এদের পিঠ চওড়া ও সমতল হয়। এদের লেজ লম্বা এবং হাত পা সরু হয়। পায়ে ঝিল্লী থাকে এবং পায়ের পাতা

ছ‍ুঁচলো হয়। এরা মাত্র ১৫ সেঃ মিঃ লম্বা হয় এবং ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ, কেঁচো ও কীটপতঙ্গ খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। গৃহপালিত কচ্ছপ রুটি এবং তরিতরকারী শাকপাতাও খায়। এই সব দেশের অধিবাসীরা এদের মাংস খুব ভালবাসে। জার্মানীর লোকেরা বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে এদের মাংস খায়।

মিঃ বেরিল লিখেছেন, ১৯২৪ সালে উত্তর আমেরিকা থেকে ২০০ স্বচ্ছজলবিহারী কচ্ছপ ইংল্যান্ডে আমদানী করা হয়েছিল। সে বছর ইংল্যান্ডের এক হোটেলে এদের মধ্যে ষাটটিকে মারা হয়েছিল। বাকী কচ্ছপগুলোকে পালন করা হয়। ইংরেজদের চেয়ে আমেরিকানদেরই এদের মাংস বেশী পছন্দ ।

কিছু কিছু কচ্ছপ কাদার মধ্যেও বাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং মধ্য-আমেরিকার কর্দমাক্ত নদী ও হ্রদে এরা থাকে। এদের উদরের গঠন এই রকম যে এরা সহজেই শরীরকে নড়াতে চড়াতে পারে । কোনা কোনো পুরুষ কচ্ছপের পায়ের ওপরে কাঁটার মত থাকে । এগুলোকে রগড়ালে এক রকমের শব্দ হয়। কর্দমবাসী কচ্ছপের দেহ থেকে এক রকমের দুর্গন্ধ বেরোয় ।

স্পেন দেশে এক বিচিত্র ধরণের কচ্ছপ দেখা যায়। তাদের বাসস্থানের জল দূষিত হয়ে গেলে তাদের এক রকমের রোগ হয় । তাদের শরীর ফুলে যায় । গায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দেয় এবং মনে হয় যেন এদের কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। কোনো কোনো কচ্ছপের শরীর অনেক রকমের রেখা ও ছাপে সুশোভিত থাকে। খুব সুন্দর দেখায় তাদের। আবার আর এক রকমের কচ্ছপের মাথায় এবং ঘাড়ে কমলালেবু রঙের অনেক রেখা থাকে এবং পিঠের কোণে কোণে ঐ রঙের বড় বড় দাগও থাকে। এক রকমের কচ্ছপের সর্বাঙ্গে লাল সিঁদুরের রঙের অনেক রেখা ও অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন এবং মাথার ওপরে লাল রঙের রেখা থাকে।

ব্রাজিলের উত্তরাংশে এবং গায়ানায় এক রকমের কর্দমবাসী কচ্ছপ দেখা যায়। মিঃ ডিটমার এদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "এদের মাথা, ঘাড় এবং শরীর এরূপ সমতল যে দেখলে মনে হয় বুঝি বা কেউ এদের শরীরের উপর দিয়ে ইস্ত্রি চালিয়ে দিয়েছে। এদের ঘাড়ে ও মুখে মাংসপিণ্ড ঝুলে থাকে। যখন এরা জলে সাঁতার কাটে তখন এই মাংসের ডেলা অদ্ভুতভাবে ছড়িয়ে যায় যার আকর্ষণে মাছেরা এদের কাছে আসে। আর এরা সেই মাছ-গুলোকে খায় ।"

'স্নেক নেক্‌ড টিরেপিন' অর্থাৎ সাপের মত গলাযুক্ত কচ্ছপের গলা খুব লম্বা হয় । গলাকে টেনে রাখতে এদের বেশ বেগ পেতে হয় । এদের গলা পিঠের ভেতরে যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়ে যায় ।

কোনো কোনো কচ্ছপের মাথা কুমীরের মাথার মত। এদের মাথা বড় হয় এবং তার সঙ্গে এক মোটা ও শক্ত ঠোঁট জোড়া থাকে। এদের লেজ মোটা হয় এবং তা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে । এজন্য দূর থেকে কুমীরের লেজের মত দেখায় । এই কারণে এই জাতের কচ্ছপকে 'অ্যালিগেটর টিরেপিন' নাম দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোতে এই জাতীয় কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায়। এরা মাছ ও জলচর পাখীদের জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কখনো কখনো এরা ওজনে ৯ কিঃ গ্রাঃ ভারী হয়। জুন জুলাই মাসে স্ত্রী-কচ্ছপেরা জল থেকে উঠে কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যায় এবং কোনো বালুকাভূমি খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেখানেই তারা একবারে ৩০।৪০টি ডিম পাড়ে। এই অবস্থায় তারা ঐ জায়গায় এক সপ্তাহকাল থাকে। কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা এদের মাংসও খায়। এমনিতে কিন্তু এদের মাংস সুস্বাদু হয় না।

স্বচ্ছজলবিহারী কচ্ছপের পিঠের ত্বকে বিভিন্ন স্তর থাকায় এদের পিঠ দেখা যায় না। এদের গলা

লম্বা ও গোল হয়। পায়ের পাতায় ঝিল্লী থাকায় এরা সহজে চলাফেরা করতে পারে। এই কচ্ছপের ১৫টি প্রজাতি রয়েছে। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়াতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের কচ্ছপ গঙ্গানদীতে দেখতে পাওয়া যায়। এদের পিঠ ৬০ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। এদের মস্তিষ্ক নষ্ট করে দেওয়ার পরেও চোয়াল উপর ও নীচে নড়তে থাকে। কেউ এদের জ্বালাতন করলে এরা ধীরে ধীরে মোটা আওয়াজ করে ।

আফ্রিকাতে এক জাতের কচ্ছপ দেখা যায়। তাকে নাইল টিউনিক্স বলা হয়। নীল নদ থেকে আরম্ভ করে কঙ্গো প্রদেশ পর্যন্ত সর্বত্র এদের দেখা যায়। গঙ্গা নদীর কচ্ছপের চেয়ে এরা সামান্য বড় হয়। একটি বৃহৎ কচ্ছপের পিঠ ৯০ সেঃ মিটারের কিছু বেশী লম্বা হয়। ওজনে এরা ১৫ কিলোগ্রাম ভারী হয়। আরবদেশ-বাসীরা কচ্ছপদের খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। কারণ তাদের বিশ্বাস, কচ্ছপরা কুমীরের ডিম খেয়ে ফেলে । তবে কখনো কখনো ওখানকার লোকেরা কচ্ছপের মাংসও খায় ।

আমেরিকার টিউনিক্স এই জাতের কচ্ছপের চেয়ে ছোট হয় । এরা ৪৫ সেঃ মিটারের বেশী লম্বা হয় না। সেখানকার লোকেরা এদের মাংস খুব তৃপ্তির সঙ্গে খায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বাজারে প্রচুর কচ্ছপ পাওয়া যায়।

নিগ্রোজাতির লোকেরা বড়শী দিয়ে কচ্ছপ ধরে। অনেকগুলো কচ্ছপ ধরা হলে পরে তাদের মাথা কেটে ফেলা হয় এবং পিঠের মাঝেখানে একটা ফুটো করে দেয়া হয় । এভাবে তাদের মারা হয় । তারপরে সম্পূর্ণ কচ্ছপটিকে ভেজে খাওয়া হয় ।

এক জাতীয় সামুদ্রিক কচ্ছপ দেখা যায় যাদের চর্বি সবুজ বর্ণের হয়। এদের সবুজ সামুদ্রিক কচ্ছপ বলা হয়ে থাকে। লোকে এদের মাংসের রসাল তরকারী বানিয়ে খায়। তারা এই মাংস খেতে খুব ভালবাসে। এই জাতের কচ্ছপ শীতোষ্ণ গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় দেশের সমুদ্রে বাস করে। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তীরপ্রান্তে এদের সাঁতার কাটতে দেখা যায়। এরা যখন ঘুমোতে ঘুমোতে সাঁতার দেয় তখন এদের ধরা খুব সহজ হয়। যখন এরা ডিম পাড়বার জন্যে তটভূমিতে আসে, তখন মাঝিমাল্লারা এদের বাঁশ দিয়ে উল্টে ফেলে দেয় এবং ধরে ফেলে।

এ জাতীয় স্ত্রী-কচ্ছপেরা বালির মধ্যে কয়েক ফুট গভীর গর্ত খোঁড়ে এবং সেখানে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো প্রায় গোলাকার হয় এবং তার ওপরে নরম চামড়ার আঁশ থাকে। এক একটি গর্তে ২০০ ডিম পাড়ে। কচ্ছপেরা এই সব গর্ত ঢেকে দেয় এবং বালিকে এমনভাবে সমতল করে দেয় যাতে গর্ত কোথায় আছে তা বোঝা যায় না।

১৮ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাচ্চাগুলো জলে নেমে পড়ে। অনেক বাচ্চা জল পর্যন্ত পেঁছিতে পারে না। বাজপাখী বা অন্যান্য পাখীরা ঠোঁটে করে তাদের তুলে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। কিংবা জলের কাছে যাওয়া মাত্রই বড় মাছেরা এদের হাঁ করে গিলে ফেলে। এদের মধ্যে বড় কচ্ছপের ওজন প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম হয়। এদের পিঠ ১ মিটারের মত লম্বা হয়। গায়ের রঙ বাদামী হয়। তার ওপরে হলদে রেখা থাকে।

হোক্স্‌উইল টার্টল নামে এক ধরণের প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক কচ্ছপ আছে। এদের মাথার খুলি খুব মূল্যবান বস্তু। এদের পিঠের ওপরে অনেক রঙের পাতলা ছাল থাকে। কচ্ছপকে জলে সিদ্ধ করে মাংস ও ছাল ধীরে ধীরে বের করে নেওয়া হয়। তারপরে যে বস্তু প্রস্তুত হবে সেই জিনিসের ছাঁচে সেগুলোকে ঢেলে রাখতে হয়। এই কচ্ছপ থেকে অনেক রকমের জিনিস তৈরী হয়।

প্রাচীনকালে লোকেরা কচ্ছপকে আগুনের উপর উল্টে টাঙ্গিয়ে রাখত। আগুনের আঁচে পিঠের

চামড়া খসে খসে পড়ত। চামড়া বেরিয়ে গেলে আবার এই হতভাগ্য জীবগুলোকে জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত । বলা হয়ে থাকে, এরপরও তাদের শরীরে আবার চামড়া গজাত।

লগারহেড কচ্ছপের আকার এক বিশেষ রকমের হয়। এদের মাথা খুব বড় হয় এবং সামনের প্রত্যেক পায়ের পাতায় দুটো করে নখ থাকে। এদের পিঠ ১ মিটারের কিছু বেশী লম্বা হয় এবং ওজন ২৫০ কিলোগ্রামের মত হয়। লোকে এদেরও মাংস খায়।

GMGIP (Pub. Unit) Sant.—S14—2 MIB/83—21-3-86—2,000.

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার